কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রমজানের ফাজায়েল, মাসায়েল ও অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

প্রশ্নোত্তরে

কিতাবুস সাওম

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।

খতীব : হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

সাবেক শাইখুল হাদীস : জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

মারকাজুল উলূম প্রকাশনা বিভাগ

মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

http://jumuarkhutba.wordpress.com

প্রশ্নোত্তরে

কিতাবুস সাওম

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

সহযোগিতায়:

মুফতী মুহা: রহমতুল্লাহ

শিক্ষক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা

প্রচ্ছদ ডিজাইন, প্রিন্টিং

মুহাম্মাদ ইসহাক খান

খান প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মোবা: ০১৭৪০১৯২৪১১

প্রকাশনায়:

মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া ঢাকা

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

http://jumuarkhutba.wordpress.com

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০১১ ইং

মূল্য ঃ ৮০ (আশি) টাকা মাত্র

Kitabus Saom

Shaikh Mufti Jashimuddin Rahmani

Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka

Price : 80.00 Tk. US.$ 4.00

সূচীপত্র

সাওম

শাহরু রামাজান। ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসেই কুরআনুল কারীমকে নাজিল করা হয়েছে। এ মাসেই রয়েছে লাইলাতুল কদর -যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসেই খুলে দেয়া হয় জান্নাতের দরজাসমূহ। বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাসমূহ। শয়তান ও দুষ্ট জীনদেরকে শেকলাবদ্ধ করা হয় এই মাসে। অসংখ্য পাপীদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয় রমজানে। এটি দু'আ কবুলের মাস। যিকির-আজকার, তাসবীহ-তাহলীল, তাওবা-ইস্তিগফার ও কুরআন তিলাওয়াতের মাস। সহমর্মিতার মাস। আত্মসংযমের মাস। এটি জিহাদের মাস। এ মাসেই সংগঠিত হয়েছিলো ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ ও মক্কা অভিযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

এ মাসেই ফরজ করা হয়েছে সিয়াম। যা ইসলামের পঞ্চবেনার একটি। এই সিয়ামের পুরস্কার দিবেন মহান আল্লাহ সুব: নিজ হাতে। কিন্তু এই সিয়ামকে যথাযথ মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে রয়েছে নানান অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার ও জাহালত। আবার কেউ রমজানকে বরণ করছে মজুতদারি ও কালোবাজারির মাধ্যমে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়ে। কেউবা পয়সার বিনিময়ে খতমে কুরআন, খতমে তাহলীল, খতমে খাজেগান, দুরূদে নারিয়া, দুরূদে তাজ, দুরূদে হাজারীসহ ইবাদতের নামে তৈরী করা বিভিন্ন বিদ'আতের মাধ্যমে। বিশেষ করে লাইলাতুল কদরে হাদিয়া নামক টাকার বিনিময়ে হুজুরকে দিয়ে বিভিন্ন খতম বখশানোর মাধ্যমে।

আবার কেউবা রমজানকে বরণ করছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার পরিবর্তে বিভিন্ন মাজারে, খানকায়, দরগায়, পীরের আস্তানায় গিয়ে খাজাবাবা, গাঁজাবাবা, লেংটাবাবা ও মাজার ওয়ালার কাছে প্রার্থনা করার মাধ্যমে। গরীব-দু:খী, অসহায় এতীম-মিসকীনদেরকে দান-খয়রাত করার পরিবর্তে বিভিন্ন মাজারে-ওরশে ও কোটিপতি পীরদেরকে টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল-মুরগী, আগরবাতি-মোমবাতি, শিরনী-জিলাপী দানের মাধ্যমে। আবার কেউবা ইফতার মাহফিলের নামে রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে।

রমজানের সিয়াম সাধনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও সঠিক শিক্ষার অবর্তমানে সৃষ্ট এই নারকীয় পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে। জানতে হবে সিয়ামের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে। চলতে হবে রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কিরাম রা. এর অনুসৃত পথে।

এই কিতাবের মাধ্যমে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলোই কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। নিম্নে শাহরু রামাদান ও সিয়াম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাসায়েল, ফাজায়েল ও এ মাসে করণীয়-বর্জনীয় বিষয়গুলো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রশ্ন: সাওম (الصوم) কাকে বলে?

উত্তর: সাওম (صـــوم) শব্দের অর্থ 'বিরত থাকা' এর বহুবচন সিয়াম (صيام)। ইসলামের পরিভাষায় সাওম (صوم) বলা হয়:

الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الي غروب الشمس مع النية

অর্থ "সুবহে সাদেক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যাতের সাথে সিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ থেকে বিরত থাকা।"

প্রশ্ন: সাওম (الصوم) এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: সাওমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ **[البقرة/১৮৩]**

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা **তাকওয়া অবলম্বন কর**।[১] এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) সিয়াম ফরজ করার উদ্দেশ্যকে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। আমরা এটাকে আরেকটু

[১] সুরা বাকারা ১৮৩।

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে গেলে যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো দেখতে পাই তা হলো নিম্নরূপ :

প্রথমত: আল্লাহ (সুব:) মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্য। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ৫৬]

অর্থ: "আমি মানুষ এবং জীনদের সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।"[২] আর সিয়ামের মাধ্যমে মানুষ তার রবের ইবাদত করে থাকে। কারণ একজন মানুষ যখন কাউকে ভালোবাসে তখন প্রথমে তার প্রতি আস্থাশীল হয়। তারপর তার আনুগত্য প্রকাশ করে। তারপর প্রয়োজনে তার জন্য বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে। তারপর তার জন্য খানা-পিনা ইত্যাদি ত্যাগ করে। ঠিক তেমনিভাবে মানুষ ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হয়। এরপর সালাতের মাধ্যমে প্রথমে আনুগত্য প্রকাশ করে। হজ্জের মাধ্যমে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে। যাকাতের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ ব্যায় করে। আর সাওমের মাধ্যমে খানা-পিনা ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে। এভাবে সিয়ামের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ (সুব:) এর চুড়ান্ত ইবাদাহ (আনুগত্য) প্রকাশ করে থাকে।

দ্বিতীয়ত: মানুষের মধ্যে দুইটি বিপরীতমুখি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য আর তা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পশুর বৈশিষ্ট্য আর তা হচ্ছে খানা-পিনা করা, স্ত্রী ব্যবহার করা, সন্তান জন্ম দেয়া, ঘুম যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এই দুইটি বৈশিষ্টের মধ্যে একমাত্র প্রথমটিই হচ্ছে মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রয়োজন। সিয়ামের মাধ্যমে মানুষ পশুর বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমাদের খাওয়া-দাওয়া, স্ত্রী ব্যবহার করার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেগুলোকে ত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদত করতে পারি।

তৃতীয়ত: সিয়ামের মাধ্যমে মানুষ তার গোপন রোগ সমূহ যথা: কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ইত্যাদির চিকিৎসা করে থাকে। কারণ যেভাবে সকল

[২] (সুরা যারিয়াত: ৫৬)

জিনিষের মৌলিক উপাদান চারটি। ক. আগুন খ. পানি গ. মাটি ঘ. বাতাস। মানুষের মধ্যেও এই চারটি মৌলিক উপাদান বিদ্যমান। আর এগুলোর প্রতিটির মধ্যে একেকটি মারত্মক ক্ষতিকর রোগ রয়েছে।

আগুনের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো অহংকার। যদি আগুন জ্বালানো হয় তাহলে তা উপরের দিকে চড়তে থাকে। এ কারণেই ইবলিস অহংকার করেছিল। পানির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো লোভ। যে কারণে পানি সমতল জায়গায় ছাড়লে সে খুব সহজেই সাধ্যমত অনেক জায়গা দখল করে নেয়। মাটির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো কৃপনতা। যে কারণে মাটির উপরে যা কিছু রাখা হয় আস্তে আস্তে সে তা নিজের ভেতরে লুকিয়ে ফেলে। আর বাতাসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজের অস্তিত্ব সর্বত্র বিরাজমান রাখা।

মানুষের মধ্যে যেহেতু উপরোক্ত চারটি উপাদানই রয়েছে তাই তার মধ্যে এই স্বভাবগুলোও বিদ্যমান। যেহেতু তার মধ্যে আগুন রয়েছে তাই তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়। এই অহংকার রোগের চিকিৎসার জন্য আল্লাহ (সুব:) সালাতের বিধান দিয়েছেন। সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সামনে হাত বেঁধে অপরাধির ন্যায় দাড়িয়ে, তারপরে রুকুর মাধ্যমে মাথা ঝুকিয়ে তারপরে সেজদার মাধ্যমে তার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ চেহারাকে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসাবে পেশ করে। সে যেন জানিয়ে দিল যে, আমি মাটি থেকেই তৈরি হয়েছি আবার মাটির সাথেই মিশে যাব আমার অহংকার করার কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى [طه: ৫৫]

অর্থ: "মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব।"[৩]

مٹادو اپني هستي كو اگر كچھ مرتبه چاهو+ كه دانه خاك ميں ملكر گل گلزار هوتاهے

[৩] সুরা তাহা ৫৫।

অর্থ:"তুমি যদি কিছু মর্যাদা অর্জণ করতে চাও তবে নিজের আমিত্বকে মিটিয়ে দাও। যেমনিভাবে একটি শস্য দানা নিজেকে মাটির সঙ্গে মিটিয়ে দিয়েএকটি সুন্দর বাগান উপহার দেয়।"

আবার যেহেতু মানুষের মধ্যে আরেকটি মৌলিক উপাদান রয়েছে মাটি। সেকারণেই মানুষ কৃপণ হয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ مُطَرِّف عَنْ أَبِيه قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْــرَأُ (أَلْهَـــاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِى مَالِى قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ (صحيح مسلم)

অর্থ: "মুতাররিফ (রা:) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল (সা:) এর নিকটে এলাম তখন তিনি الهـــاكم التكـــاثر পাঠ করছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: বনি আদম বলে থাকে 'আমার মাল, আমার মাল'। রাসূল (সা:) বলেন হে বনী আদম তুমি কি চিন্তা করে দেখেছ যে, তোমার কি মাল? তোমার মাল তো শুধু তাই যা তুমি পেট ভরে খেয়েছ এবং নষ্ট করেছ অথবা পরিধান করেছ এবং পুরাতন করেছ অথবা সাদাকাহ করেছ (আল্লাহর কাছে সঞ্চয় করেছ)। সুতরাং যেহেতু মানুষের মধ্যে এই কৃপণতার রোগ রয়েছে তাই এ রোগের চিকিৎসার জন্য আল্লাহ তায়ালা যাকাতের বিধান দিয়েছেন।

মানুষের মধ্যে আরেকটি মৌলিক উপাদান রয়েছে বাতাস। আর এই বাতাসের কারণেই মানুষ চায় যে সবাই তাকে জানুক। তার নাম প্রচার হোক। অর্থাৎ 'রিয়া' বা লৌকিকতা। অথচ এ 'রিয়া' বা লৌকিকতা হচ্ছে গোপন শিরক। তাই এ রোগের চিকিৎসার জন্য ফরজ করা হয়েছে হজ্জ। হজ্জের জন্য মানুষকে এহরামের কাপড় পড়তে হয় এর মাধ্যমে পোষাকের গৌরব, ভাষার গৌরব ত্যাগ করে আরাফাহ, মুযদালাফাহ ও মিনার ময়দানে সাদা-কালো, আমীর-গরীব সকলকে একই ময়দানে অবস্থান করতে হয় কারো কোন বিশেষ মর্যাদা থাকে না। আর যখন কোন আলাদা বিশেষত্ব না থাকে তখন আর নাম-দাম প্রকাশের কোন সুযোগও থাকে না। এভাবে হজ্জের মাধ্যমে 'রিয়া' রোগের চিকিৎসা হয়ে যায়।

সর্বশেষ মৌলিক উপাদান হচ্ছে পানি। আর পানি স্বভাবগত বৈশিষ্ট হচ্ছে লোভ। সে কারণেই পানি যদি কোন সমতল জায়গায় ঢেলে দেওয়া হয় তাহলে সে আস্তে আস্তে আরো অনেক জায়গা দখল করে নেয়। মানুষের মধ্যে যেহেতু পানি আছে তাই এই পানির কারণেই মানুষের মধ্যে লোভ বিদ্যমান। যার ফলে সে সবসময় চিন্তা করে কিভাবে অন্যের সম্পদ, জায়গা-জমি দখল করা যায়, কিভাবে ভাল খাবার-দাবার, দামী পোষাক-পরিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে অন্যের সুন্দরী স্ত্রী অথবা সুন্দরী মেয়েকে ভোগ করা যায়। এই রোগের চিকিৎসার জন্য আল্লাহ তায়ালা সাওমকে ফরজ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة/১৮৩]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, **তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে,** যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।"[৪]

একজন মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সিয়াম পালন করে তখন তার সামনে যত লোভনীয় খানা-পিনা, সুন্দরী নারী পেশ করা হোক না কেন সে এগুলো আল্লাহকে ভয় করে বর্জন করবে। এটাকেই হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّوْمَ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী (সা:) বলেছেনঃ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ **"কিন্তু রোযা আমারই জন্য** এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করবো। কেননা সে আমার জন্যই তার কামনা-বাসনা, খানা-পিনা ত্যাগ করে।"[৫]

এই হাদীসে বলা হয়েছে, 'সাওম আমারই জন্য': অথচ সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য। তবে অন্যান্য ইবাদত যেমন, সালাত, হজ্জ, যাকাত

[৪] সুরা বাকারা ১৮৩।

[৫] সহীহ বুখারী /৬৯৮৪ ; সহীহ মুসলিম /২৫৭৩ ; সুনানে নাসাঈ /২২১১ ; সুনানে তিরমিজি /৭৬১; সনানে ইবনে মাজাহ ১৬৩৮।

ইত্যাদি লোক দেখানোর জন্য কেউ কেউ করতে পারে। কিন্তু রোযার মধ্যে লোক দেখানোর প্রবৃত্তি থাকে না। কারণ গোপনে পানাহার করলে আল্লাহ ছাড়া কেউই জানতে পারে না। আর একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া কিছু তাকে বাধা দেয় না। তাই আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান দিবেন। আর দাতা যখন নিজ হাতে দান করেন বেশীই দান করেন।

এ হাদীসে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সিয়ামের মাধ্যমে মানুষ তার রবের সন্তুষ্টির জন্য লোভ নিয়ন্ত্রণ করে পশুত্বের স্বভাবকে বিসর্জন দিয়ে 'আবদিয়্যাত' বা 'আল্লাহর দাসত্বের' সিফাতকে অর্জন করে। সুতরাং যদি সাওমের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হয় তাহলে শুধু শুধু খানা-পিনা ত্যাগ করে কোন লাভ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা:) এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করা সত্ত্বেও মিথ্যা কথা ও হারাম কাজ ত্যাগ করতে পারল না। তার খাবার-দাবার পরিত্যাগ করার ব্যাপারে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"[৬]

অন্য এক হাদীসে রাসূলূল্লাহ (সা:) এরশাদ করেন:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من صائم ليس له من صيامه الا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر (سنن الدارمي)

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, অনেক সায়েম এমন আছে যার ভাগ্যে ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া অন্য কিছুই নাই। অনেক রাত্রি জাগরণ করে ইবাদতকারী আছেন যাদের ভাগ্যে রাত্রি জাগরণ ব্যতিত আর কিছুই নাই।"[৭]

এ হাদীসগুলোতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শুধু ক্ষুধার্ত এবং পিপাসায় কাতর থাকার নামই সাওম নয়। বরং এর মাধ্যমে সকল প্রকার

[৬] সহীহ বুখারী ১৯০৩।

[৭] সুনানে দারমী ২/৩০১, হাদীসটি সহীহ।

পশুত্বকে বর্জন করে এক ‘ইলাহের’ বিধান মেনে নিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করাই সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য। সিয়াম অবস্থায় যখন আমরা উন্নতমানের খাবার ও সুন্দরী যুবতী নারীদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ (সুব:) এর নির্দেশ মেনে তা থেকে বিরত থাকি সেই একই আল্লাহর নির্দেশ মেনে মিথ্যা কথা, ধোঁকা দেওয়া, চোগলখোরি করা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জেনা, ব্যাভিচার, রাহজানি, মদ, সুদ, জুয়া, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, খুন, ধর্ষণ, মূর্তিপূজা, আগুনপুজা, পীরপূজা, গাছপূজা, মাছপূজা, পাথরপূজা, মাজারপূজা, মন্ত্রিপূজা, এম-পি পূজা, নেতা-নেত্রী পূজাসহ সব কিছুকে বর্জন করতে হবে। এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণিত হলো যে সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ, এই চারটি হচ্ছে মৌলিক চারটি রোগের ঔষধ। আর এ কথা সকলেরই জানা যে, ঔষধ খেতে হলে অব্যশই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। উল্টা -পাল্টা খেলে লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার আশংকাই বেশী। ঠিক তেমনিভাবে এই চারটি ঔষধকেও নিজের মন মতো আদায় করলে চলবে না। বরং আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরীকা অনুযায়ী করতে হবে। এজন্যই একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ (بخاري ومسلم)

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানে সিয়াম পালন করা এবং হজ্জ করা।[৮]

এই হাদীসে ইসলামকে একটি তাবুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাবুর চার কোণায় চারটি খুটি থাকে এবং মাঝখানে একটি বড় পিলার থাকে। এই বড় পিলারটি যদি না থাকে তাহলে ঐ চার কোনার চারটি পিলারের কোনই মূল্য থাকে না। ঠিক তেমনিভাবে সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ এগুলোরও কোনই মূল্য থাকবে না যদি শিরকমুক্ত তাওহীদ ও

[৮] সহীহ মুসলিম ১৯ নং হাদীস; সহহি বুখারী ৮ নং হাদীস; সুনানে তিরমিজি ২৬০৯ নং হাদীস।

বেদআ'তমুক্ত সুন্নাহর উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়। একারনেই এ হাদীসে বলা হয়েছে ইসলামের বেনা পাঁচটি। আর তার মূল বেনা হলো ঈমান। আর এই কারণেই সাওমের সঙ্গেও এই শর্তটি গুরুত্বসহকারে জুড়ে দেয়া হয়েছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَـــا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ(صحيح البخاري)

অর্থ: আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে ইবাদত করে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[৯] এই হাদীসে স্পষ্টভাবে ঈমানের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই তাওহীদের আক্বিদাহর ভিত্তিতে যদি সিয়াম পালন করা হয় তবেই সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

চতুর্থত: সিয়ামের মাধ্যমে গরীব-দু:খী ও অসহায় মানুষের সত্যিকার অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। কেননা সায়েম ব্যক্তি ভোর রাতে সাহ্‌রী খেয়ে আবার ইফতারীর পরে হরেক রকম খাবারের আয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিকেল বেলা ক্ষুধার তাড়নায় ক্লান্ত হয়ে পরে। তাহলে যে গরীব পিছনের বেলা খেতে পায় নি, ভবিষ্যতের জন্য তার কোন আয়োজন নেই, তার মনের অবস্থা কি? এটা উপলব্ধি করে একদিকে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। অপরদিকে গরীব-দু:খী মেহনতি মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা সিয়ামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে:

عن سلمان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو شهر المواســـاة

(صحيح ابن خزيمة لمحمد النيسابوري)

[৯] সহীহ বুখারী ৩৭; সহীহ মুসলিম ১৬৫৬।

অর্থ: "সালমান (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুলাহ (সা:) বলেছেন: রমজান মাস হচ্ছে সহমর্মিতার মাস।"[১০]

প্রশ্ন: সিয়াম কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: সিয়াম প্রথমত: চার প্রকার। ফরজ, নফল, হারাম ও মাকরূহ।

ফরজ সিয়াম: আবার তিন প্রকার। (ক) রমজানের সিয়াম। (খ) কাফফারার সিয়াম। (গ) মান্নতের সিয়াম।

নফল সিয়াম: কয়েক প্রকার। (১) শাওয়াল মাসে ছয়টি সাওম। (২) জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন বিশেষ করে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকারী হাজীগণ ছাড়া সাধারণ মুসলমানদের জন্য আরাফাতের দিন সাওম। (৩) মুহাররম মাসের সাওম। বিশেষ করে আশুরার দিন ও তার আগের বা পরের দিন সহ। (৪) শাবান মাসের বেশির ভাগ অংশ সিয়াম পালন করা। (৫) 'আশহুরুল হুরুম' (জিলক্বদ, জিলহজ্জ, মুহাররম, রজব) মাসের সিয়াম। (৬) প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতি বারের সিয়াম। (৭) প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ (আইয়্যামে বিজ) এর সিয়াম। (৮) সাওমে দাউদ (একদিন পর একদিন সাওম রাখা অর্থাৎ একদিন সাওম রাখবে এরপর রাখবে না)।

হারাম সাওম: (১) দুই ঈদের দুইদিন। (২) 'আইয়্যামে তাশরিক' (কুরবানী ঈদের পর তিনদিন)।

মাকরূহ সাওম: (১) শুধু জুমুআর দিন খাস করে সাওম রাখা। কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ ».(صحيح مسلم)

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: জুমু'আর দিন কেউ যেন সাওম না রাখে। কিন্তু যদি কেউ

[১০] সহীহ ইবনে খুজাইমাহ ১৮৮৭।

জুমুআর দিনের আগে বা পরে একদিন সাওম রাখে তাহলে সে জুমু'আর দিন সাওম রাখতে পারবে।"[১১]

(২) শুধু শনিবার দিন সাওম রাখা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن عبد الله بن بسر عن أخته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه (سنن الترمذي)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা:) তার বোন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা শনিবার দিন ফরজ সাওম ব্যতিত অন্য কোন সাওম রাখিও না। এমনকি যদি তোমরা আংগুরের গাছের ছাল অথবা যে কোন গাছের ডাল ছাড়া অন্য কিছু না পাও তাহলে তাই চিবাবে।"[১২] (তবুও শুধু শনিবারে সাওম রাখবে না কেননা এ দিনটাকে ইয়াহুদীরা সম্মান করে থাকে)।

(৩) 'ইয়াওমুশ শাক' বা 'সন্দেহের দিনের' সাওম। শাবান মাসের ২৯ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ তারিখকে 'সন্দেহের দিন' বলা হয়। এই দিন সাওম রাখা নিষেধ। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن عمار بن ياسر : من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا القاسم (سنن الترمذي)

অর্থ: "আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন সাওম রাখবে সে আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বিরোধিতা করলো।"[১৩] অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ » (سنن أبي داود للسجستاني)

[১১] সহীহ মুসলিম ২৫৪৯।

[১২] সুনানে তিরমিজি ৭৪৪; হাদীসটি সহীহ।

[১৩] সুনানে তিরমিজি ৬৮১;

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা রমজানের পূর্বে একদিন বা দুইদিন অগ্রিম সাওম রাখিও না। তবে যদি কোন ব্যক্তি ঐ দিন সাওম রাখতে অভ্যস্থ হয় তাহলে সে সাওম রাখতে পারবে।"[১৪]

এ হাদীসেও একদিন আগে চাঁদ দেখা যেতে পারে এই সন্দেহের উপর ভিত্তি করে একদিন বা দুইদিন আগে সাওম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

(৪) 'সাওমে দাহার'। নিষিদ্ধ দিবস সমূহ সহ সারা বছর সাওম রাখা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ (البخاري)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: যে ব্যক্তি সারা বছর সাওম রাখল তার কোন সাওম নাই।"[১৫]

(৫) স্বামী বাড়িতে থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ব্যতিত স্ত্রী নফল সাওম রাখা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ(مسند احمدو البخاري ومسلم بتغيير يسير

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: কোন মহিল স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতিত রমজানের সাওম ছাড়া কোন নফল সাওম রাখবে না।"[১৬]

(৬) 'সাওমে বেসাল' একাধারে কোন প্রকার ইফতার বা রাতের খাবার গ্রহণ করা ছাড়া কয়েকদিন সাওম রাখা। এ ধরণের সাওম আল্লাহর রাসূল (সা:) নিজে রাখতেন তবে উম্মতের জন্য নিষেধ করেছেন। যা নিম্নের হাদীসটিতে কারণসহ উল্লেখ রয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي

[১৪] সুনানে আবু দাউদ ২৩৩৭ । হাদীসটি সহীহ।

[১৫] সহীহ বুখারী ১৯৭৯।

[১৬] সহীহ বুখারি ৪৮৯৯ মুসনাদে আহমদ ৭৩৪৩ তিরমিজি ৭৮২।

أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ٥(مسند أحمد و البخاري و مسلم)

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: খবরদার! তোমরা সাওমে বেসাল থেকে বেঁচে থাক। একথাটি তিনি তিনবার বললেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো 'বেসাল' করেন? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন তোমরা এ ব্যাপারে আমার মতো নও। আমি যখন রাতের বেলায় ঘুমাই তখন আমার রব আমাকে খাওয়ান এবং পান করান। সুতরাং তোমরা যে পরিমাণ আমল করতে সক্ষম সে পরিমাণ দায়িত্ব নাও।"[১৭]

প্রশ্ন: ইসলামী শরীয়তে রমজানের সিয়ামের বিধান কি?

উত্তর: রমজান মাসের সিয়াম ফরজ এবং এটি ইসলামের 'পঞ্চবেনা'র একটি। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) এরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة/১৮৩]

অর্থ: "হে মুমিনগণ! **তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে,** যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।"[১৮]

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) সুস্পষ্টভাবে রমজানের সিয়ামকে ফরজ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। এখানে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, সিয়াম পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের উপরও ফরজ ছিল। পবিত্র কুরআনের আরো একটি আয়াত দ্বারা সিয়াম ফরজ প্রমাণিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة/১৮৫]

অর্থ: "রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার

[১৭] সহীহ বুখারী ১৮৬৫ সহীহ মুসলিম ২৬২২ মুসনাদে আহমদ ৭১৬২।

[১৮] সুরা বাকারা ১৮৩।

পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং **তোমাদের মধ্যে যে কেহ মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।**"[১৯]

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমাদের মাঝে যে কেউ রমজান মাস পাবে তাকে অবশ্যই 'সাওম' রাখতে হবে। ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতো সাওমও পর্যায়ক্রমে ফরজ করা হয়েছে। শুরুতে নবী (সা:) মুসলিমদেরকে মাত্র প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন করার এবং আশুরার সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সাওমসমূহ ফরজ ছিল না। তারপর দ্বিতীয় হিজরীর ২য় শাবান রমজান মাসে সাওমের এই বিধান কুরআনে নাজিল হয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) পবিত্র হাদীসে ইরশাদ করেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ (بخاري ومسلم)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানে সিয়াম পালন করা এবং হজ্জ করা।"[২০]

এই হাদীসে ইসলামকে একটি তাবুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যার পাঁচটি খুঁটি বা পিলার থাকে। ইসলামের এই পাঁচটি পিলারের একটি হলো 'সিয়াম'। রমজানের সিয়াম ফরজ এবং ইসলামের পঞ্চবেনার একটি এ ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ একমত। কারো কোন দ্বিমত নেই। যে ব্যক্তি সিয়াম ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের ও মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন: সিয়ামের রোকন কয়টি ও কি কি?

উত্তর: সিয়ামের রোকন বা ফরজ দুইটি।

প্রথমত: নিয়্যাত করা (النية)। অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে যে রকম নিয়্যাত করা ফরজ। ঠিক তেমনিভাবে সিয়ামের ক্ষেত্রেও নিয়্যাত করা ফরজ। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

---

[১৯] সুরা বাকারা ১৮৫।

[২০] সহীহ মুসলিম ১৯ নং হাদীস; সহহি বুখারী ৮ নং হাদীস; সুনানে তিরমিজি ২৬০৯ নং হাদীস।

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة/٥]

অর্থ: "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত' করে তাঁরই জন্য দীনকে খালিস করে।"[২১]

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেকোন ইবাদতে শুধুমাত্র আল্লাহ (সুব:) এর নৈকট্য লাভের খালেস নিয়্যাত করতে হবে। একারণেই যে কোন ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। একটি হলো 'ইখলাসুন নিয়্যাত' আর দ্বিতীয়টি হলো 'ইত্তিবাউস্‌সুন্নাহ'।

নিয়্যাত খাঁটি না হলে শিরক হয়। আর **শিরকযুক্ত ইবাদত** আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অপরদিকে যত ইখলাসের সঙ্গেই ইবাদত করা হোক না কেন যদি 'ইত্তিবায়ে সুন্নাত' বা রাসূল (সা:) এর তরিকা অনুসরণ করা না হয় তাহলে সেটি হবে 'বিদআত'। ইবাদতের নামে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন-সুন্নাহর দলীল প্রমাণ ছাড়া নবআবিস্কৃত কোন **বিদ'আতযুক্ত ইবাদত** আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নিয়্যাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) পবিত্র হাদীসে ইরশাদ করেন:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (رواه البخاري و مسلم)

অর্থ: "ওমর ইবনে খাত্তার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।"[২২]

এ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সা:) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, নিয়্যাত ছাড়া কোন আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আর সিয়ামও গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। তাই সিয়ামেও নিয়্যাত করা ফরজ।

দ্বিতীয়ত: الامساك عن المفطرات। সিয়াম বিনষ্টকারী কাজ থেকে বিরত থাকা।

সিয়ামের দ্বিতীয় রোকন হচ্ছে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম বিনষ্টকারী কাজ যথা খানা-পিনা ও স্ত্রীসহবাস করা থেকে বিরত থাকা। কেননা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

---

[২১] সুরা বাইয়িনা ৫ নং আয়াত।

[২২] সহীহ মুসলিম ৫০৩৬; সহীহ বুখারী ১ নং হাদীস।

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة/١٨٧]

অর্থ: "অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান করো। আর আহার করো ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।"[২৩]

এই আয়াতে সাদা রেখা বলতে দিনের আলো আর কালো রেখা বলতে রাতের আঁধারকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন: নিয়্যাত কাকে বলে? নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করা কি জরুরি?

উত্তর: নিয়্যাতের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বুখারী শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

النية هي قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات إلا في النسك فإن النبي كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجة (إتحاف القاري بدرر البخاري ص: ٩)

অর্থ: "নিয়্যাত বলা হয় 'মনের ইচ্ছা, সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করাকে।' হজ্জ ছাড়া কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। শুধুমাত্র হজ্জের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা:) তালবিয়ার সাথে 'লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জাতান' বলে মনের ইচ্ছাকে মুখেও প্রকাশ করেছেন।"[২৪]

ফিকহুস সুন্নাহ নামক গ্রন্থে নিয়্যাতের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে:

النية هي القصد الي الفعل امتثالا لامر الله تعالي و طلبا لوجهه الكريم

অর্থ: "আল্লাহর নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার দৃঢ় সংকল্প করা।"

আমাদের দেশে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অর্থ না জেনে **'নিয়্যাত মুখস্ত করার'** যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা একটি 'প্রচলিত বিদ'আত'। কেননা নিয়্যাত যেহেতু মনের সংকল্প তাই এর সাথে মুখের উচ্চারণের কোন

[২৩] সুরা বাকার ১৮৭ নং আয়াত।
[২৪] ইত্তিহাফুল ক্বারী বি দুরারিল বুখারী ৬নং পৃষ্টা।

সম্পর্ক নেই। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি ভোর রাতে উঠে সিয়ামের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় সাহ্‌রী খায় তাতেই তার নিয়্যাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি কেউ সাহ্‌রী নাও খায় কিন্তু মনে মনে নিয়্যাত করে নেয় তাতেও নিয়্যাত শুদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: নিয়্যাত কি রাতেই করতে হবে নাকি দিনের বেলাও করা যাবে?

উত্তর: অধিকাংশ আলেমদের মতে রমজান মাসের প্রতি রাতে সুবহে সাদেকের পূর্বে নিয়্যাত করা শর্ত। কারণ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن حفصة عن النبي صلى الله عليه و سلم : قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له (رواه الترمذي)

অর্থ: "হাফসা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বেই সিয়ামের চুড়ান্ত প্রতিজ্ঞা (নিয়্যাত) করল না তার সিয়াম শুদ্ধ হবে না।"[২৫]

হানাফী ইমাম ও অন্যান্য আলেমদের মতে রাতের বেলায় নিয়্যাত করা শর্ত নয়। বরং দ্বীপ্রহরের কিছু পূর্ব পর্যন্ত নিয়্যাত করার সুযোগ আছে। তারা নিম্নের হাদীসটি দিয়ে দলীল পেশ করেন:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ – رضى الله عنها – قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ قَالَ فَإِنِّى صَائِمٌ (رواه مسلم)

অর্থ: "উম্মুল মুমিনীন আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে বললেন, হে আয়শা! তোমাদের কাছে কি খাওয়ার মত কিছু আছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে খাওয়ার মত কিছুই নেই। তিনি বললেন, তাহলে আমি রোজাদার।"[২৬]

এই হাদীসে দেখা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সা:) দিনের বেলায় সাওমের নিয়্যাত করলেন। একারণেই হানাফী ইমামগণ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম শাফেয়ী (রহ:) এর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী যদি রাতের বেলায় কিছু না খেয়ে থাকে অথবা নিয়্যাত না করে থাকে তাহলে দিনের বেলায়

[২৫] সুনানে তিরমিজি ৮৩০ হাদীসটি সহীহ। সনানে আবু দাউদ ২৪৫৬ নং হাদীস
[২৬] সহীহ মুসলিম ২৫৮০; সুনানে তিরমিজি ৭৩৩ হাদীসটি সহীহ; সুনানে নাসায়ী ২৬৩১।

নিয়্যাত করলেও চলবে। তবে হানাফী মাযহাব ও ইমাম শাফেয়ী (র:) এর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী দ্বীপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নিয়্যাত করা যাবে কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এর মত অনুযায়ী দ্বীপ্রহরের আগে ও পরে সবই সমান।[২৭]

কিন্তু যারা রাতের বেলায় সুবহে সাদেকের পূর্বে নিয়্যাত করা শর্ত বলেন তারা এই হাদীসটিকে নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। কেননা এ হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) আয়শা (রা:) এর কাছে খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিন্তু খাবারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তিনি সিয়ামের নিয়্যাত করলেন এতে প্রমাণ হয় যে নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে দিনের বেলায় নিয়্যাত করলেও চলবে। সুবহে সাদেকের পূর্বে নিয়্যাত করা শর্ত নয়।

প্রশ্ন: সিয়াম ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত কি?

উত্তর: সাওম ফরজ হওয়ার জন্য **مسلم** (মুসলিম), **عاقل** (জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া), **بالغ** (প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া), **صحيح** (সুস্থ হওয়া), **مقيم** (মুকিম হওয়া) এবং মহিলারা হায়েজ ও নেফাস থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত। সুতরাং কাফের, পাগল, নাবালেগ শিশু, রোগী, মুসাফির এবং ঋতুবতী ও নিফাস ওয়ালা মহিলাদের উপর সিয়াম ফরজ নহে। তবে কাফের ও পাগলের উপর সিয়াম একেবারেই ফরজ নয়। শিশু যদি বালেগ হওয়ার কাছাকাছি হয় তাহলে তার ওয়ালী (অভিভাবক) তাকে সিয়ামের নির্দেশ দিবে। আর অসুস্থ রোগী, মুসাফির ও ঋতুবতী মহিলাগণ পরবর্তীতে কাজা করবে। একেবারে বৃদ্ধ নারী-পুরুষ যারা সিয়াম পালনে অক্ষম ও অসুস্থ রোগী যার সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই তারা **'ফিদইয়া'** দিবে। কাজা করতে হবে না।

প্রশ্ন: 'ফিদইয়া' কি? কার উপর 'ফিদইয়া' ওয়াজিব?

উত্তর: 'ফিদইয়া' হচ্ছে একজন মিসকিনের একদিনের খাবার। যারা বার্ধক্যজনিত কারণে অথবা স্থায়ীভাবে অসুস্থ হওয়ার কারণে সিয়াম পালনে একেবারে অক্ষম না হলেও কষ্ট হবে তাদের উপর 'ফিদইয়া' আদায় করা ওয়াজিব। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

[২৭] ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৩২।

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة/১৮৪]

অর্থ: "আর যাদের সাওম রাখার সামর্থ্য আছে (এরপরও সাওম রাখে না)তারা যেন ফিদয়া দেয়। একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।[২৮]

ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতো সাওমও পর্যায়ক্রমে ফরজ হয়। শুরুতে রাসূল (সা:) মুসলিমদের প্রতি মাসে মাত্র তিন দিন সাওম রাখার বিধান দেন। এ সাওম ফরজ ছিল না । তারপর দ্বিতীয় হিজরীতে রমজান মাসে সাওমের এই বিধান কুরআনে নাজিল করা হয়। তবে এতটুকুন সুযোগ দেয়া হয়। সাওমের কষ্ট বরদাশত করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা সাওম রাখবেন না তার প্রত্যেক সাওমের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে আহার করাবে। পরে দ্বিতীয় বিধানটি নাজিল হয়। এতে পূর্ব প্রদত্ত সাধারণ সুযোগ বাতিল করে দেয়া হয়। কিন্তু রোগী, মুসাফির, গর্ভবর্তী মহিল বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা এবং সাওম রাখার ক্ষমতা নেই এমন সব বৃদ্ধদের জন্য এ সুযোগটি আগের মতোই বহাল রাখা হয়। পরে তাদের অক্ষমতা দূর হয়ে গেলে রমজানের যে ক'টি সাওম তাদের বাদ গেছে সে ক'টি পূরণ করে দেয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

সুতরাং একেবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং যে অসুস্থ রোগী -যাদের সুস্থ হওয়ার কোন আশা নেই- তারা 'ফিদ্ইয়া' আদায় করবে। আর তা হলো প্রতি দিনের সাওমের বিনিময়ে একজন মিসকিন খাওয়ানো। উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

عن عطاء انه سمع ابن عباس يقرأ { وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين } . قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا (كما في صحيح البخاري)

অর্থ: "আতা (রহ:) বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) কে এই আয়াতটি পাঠ করতে শুনলেন 'আর যাদের জন্য তা (সিয়াম) কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া– একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা' -এবং বললেন যে, "এ আয়াতটি মানসূখ (রহিত) নয় বরং বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা মহিলা যারা দুর্বলতার কারণে সিয়াম পালনে অক্ষম। **এমনিভাবে যে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ্য হওয়ার কোন আশা নেই এমন লোকদের জন্য এটি প্রযোজ্য।** তারা এ

[২৮] সুরা বাকারা ১৮৪ নং আয়াত।

আয়াত অনুযায়ী প্রতিদিনের সাওমের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাবার দিবে।"[২৯]

প্রশ্ন: কোন্ কোন্ অবস্থায় রমজান মাসে সিয়াম না রেখে পরবর্তীতে কাজা করা যায়েজ?

উত্তর: সাময়িক অসুস্থ রোগী যার সুস্থ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং মুসাফির ব্যক্তির জন্য রমজান মাসে সাওম না রেখে সুবিধা মত অন্য সময়ে কাজা করা যায়েজ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]

অর্থ: "আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আলাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না।"[৩০] তবে তারা যদি এ অবস্থায় কষ্ট করে সিয়াম রেখে নেয় তাহলে আদায় হয়ে যাবে। (উল্লেখ্য যে, এরা সাওম না রেখে প্রয়োজনে খাবার-দাবার গ্রহণ করতে পারবে তবে সাওম পালনকারীদের সম্মুখে পানাহার থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত। প্রয়োজনে গোপনে খাবে।)

প্রশ্ন: কোন কোন অবস্থায় রমজান মাসে সিয়াম রাখা হারাম, পরবর্তীতে কাজা করা ফরজ?

উত্তর: মহিলাদের হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় সিয়াম রাখা হারাম। তারা রমজানের সাওম পরবর্তীতে কাজা করে নিবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ

[২৯] সহীহ বুখারী ৪১৫৩ নং হাদীস।
[৩০] সুরা বাকার ১৮৫ নং আয়াত।

الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদকা করতে থাকো। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক।

তাঁরা আরয করলেন: কী কারণে, ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন: তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর না-শোকরী করে থাকো। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ক্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদা সতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধিহরণে তোমাদের চাইতে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন: আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ক্রুটি কোথায়, ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন: একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেন: এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ক্রুটি। **আর হায়েজ অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না?** তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন: এ হচ্ছে তাদের দীনের ক্রুটি।[৩১]

এ হাদীসে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হায়েজ অবস্থায় মেয়েলোকরা সিয়াম ও সালাত উভয়টি থেকেই বিরত থাকবে। পরে কাজা করতে হবে কিনা সেই আলোচনা এই হাদীসে নেই। সে জন্য আমরা আয়শা (রা:) এর আরেকটি হাদীসের শরণাপন্ন হচ্ছি। হাদীসটি হলো:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. (صحيح مسلم)

অর্থ: "মুআযা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদিন আয়শাকে জিজ্ঞাস করলাম, ঋতুবতী মহিলা তার রোজার কাজা করবে অথচ তাকে নামাজ কাজা করতে হবে না এটা কেমন কথা। একথা শুনে আয়েশা (রা:) বললেন, তুমি কি হারুরীয়ার অধিবাসিনী? মুআযা বলেন, আমি

[৩১] সহীহ বুখারী ২৯৮।

বললাম না, আমি হারুরীয়ার অধিবাসিনী নই। বরং আমি শুধু ব্যাপারটি জানতে চাচ্ছি। আয়শা বললেন, নবী (সা:) এর সময়ে আমরা ঐ অবস্থায় পতিত হলে আমাদেরকে **রোজা কাজা করার হুকুম দেয়া হতো** কিন্তু নামাজ কাজার জন্য আদেশ করা হতো না।[৩২]

এ হাদীসটিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, হায়েজ অবস্থায় সালাত ও সাওম উভয়টিই নিষিদ্ধ। তবে সালাতের কাজা করতে হবে না। কারণ তাতে মহিলাদেরকে حرج عظيم (মারাত্মক সমস্যা) য় পতিত হতে হবে। কেননা প্রতি মাসেই হায়েজ আসবে আর প্রতি মাসেই কাজার বোঝা মাথায় চাপতে থাকবে। আর শরীয়তের নীতিমালা হলো الحرج مدفوع (সমস্যা অপসারিত)। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে:

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج ٧٨}

অর্থ: "দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।"[৩৩] সুতরাং তার উপর সালাত কাজা করা ওয়াজিব হবে না। তবে সাওম যেহেতু বছরে ঘুরে একবারই আসে তাই তা কাজা করতে তেমন সমস্যা হবে না। এই কারণে তার উপর সাওম কাজা করা ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন: কি কি কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয় অথবা হয় না?

উত্তর: যে সকল কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয় তা দুই প্রকার:

(ক) ঐসকল কারণ যার মাধ্যমে সাওম ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাজা ওয়াজিব হয়।

(খ) ঐসকল কারণ যার মাধ্যমে সাওম ভেঙ্গে যায় এবং কাজা ও কাফ্ফার উভয়টাই ওয়াজিব হয়।

প্রথম প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা:

(এক, দুই) ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া বা পান করা। যদি কেউ ভুলে অথবা অসতর্কতার কারণে অথবা জোরপূর্বক বাধ্য করার কারণে পানাহার করে তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ হবে না এবং তার উপর কাজা কাফফারা কোনটাই ওয়াজিব হবে না। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

[৩২] সহীহ মুসলিম ৬৬৯।
[৩৩] সুরা হজ্জ ৭৮।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (رواه مسلم)

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: **যে ব্যক্তি সাওম অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়েছে বা পান করেছে সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন**।"[৩৪]

তবে ভুলে খাওয়ার পরে যদি সাওম ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাপূর্বক খায় বা পান করে তাহলে এই পরবর্তী খাওয়া বা পান করার কারণে সাওম ভেঙ্গে যাবে। এ অবস্থায় শুধু কাজা করতে হবে তবে কাফফারা দিতে হবে না।

(তিন) ইচ্ছাকৃতভাবে (মুখ ভরে) বমি করা। যদি অনিচ্ছাকৃত বমি হয় তাহলে সাওম ভঙ্গ হবে না এবং তার উপর কাযা কাফ্ফারা কোনটাই ওয়াজিব হবে না। হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ذرعه القيئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض) (رواه سنن الترمذي)

অর্থ: "যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হল তার উপর সাওম কাযা করা ওয়াজিব হবে না। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করল সে তার সাওম কাযা করবে।"[৩৫]

(চার, পাঁচ) হায়েজ এবং নেফাস। যদি সূর্যাস্তের পূর্বমুহুর্তেও হায়েজ বা নেফাসের রক্ত দেখা যায় তবুও সাওম ভেঙ্গে যাবে।

(ছয়) ইচ্ছাকৃত বির্যপাত ঘটানো। চাই তা স্ত্রীকে চুমু দেওয়ার কারণে হোক অথবা আলিঙ্গন করার কারণে হোক অথবা হস্তমৈথুনের কারণে হোক সাওম ভেঙ্গে যাবে এবং শুধুমাত্র কাজা ওয়াজিব হবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তবে মহিলাদের দিকে শুধু তাকানের কারণে যদি বির্যপাত ঘটে তাহলে তার সাওম ভাঙ্গবে না এবং কাজা-কাফফার কোনটাই ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ মযি বের হলেও সাওম ভাঙ্গবে না। সিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলেও সিয়াম ভাঙ্গবে না।[৩৬]

[৩৪] সহীহ মুসলিম ২৫৮২ নং হাদীস;
[৩৫] সুনানে তিরমিজি ৭১৬ নং হাদীস; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৬৭৬ নং হাদীস।
[৩৬] ফিকহুস সুন্নহ ১/৩৪৪।

(সাত) খাবার হিসাবে ব্যবহার হয় না এমন জিনিষ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে খায় তাহলেও সাওম ভেঙ্গে যাবে। যেমন কেউ একটি কঙ্কর বা একটি লোহার বা সীসার গুলি অথবা একটি পয়সা গিলে ফেলল অর্থাৎ এমন জিনিষ গিলে ফেলল যা লোকে সাধারণত: খাদ্যরূপেও খায় না বা ঔষধরূপেও সেবন করে না, তবে সাওম ভঙ্গ হবে।

(আট) যদি কোন ব্যক্তি সাওম ভেঙ্গে ফেলার দৃঢ় ইচ্ছা করে তাহলেও তার সাওম ভেঙ্গে যাবে যদিও কোন খাবার গ্রহণ না করে। কেননা নিয়্যাত করা সাওমের একটি রোকন সুতরাং যখন তা ভেঙ্গে যাবে তখন সাওমই ভেঙ্গে যাবে।[৩৭] (এই মাসআলাটিতে অনেক আলেমের দ্বিমত রয়েছে। তাদের মতে সাওম ভাঙ্গার নিয়ত করা সত্ত্বেও কোন প্রকার খানাপিনা বা স্ত্রী সহবাস না করলে সাওম ভঙ্গ হবে না -এটি হানাফী উলামায়ে কিরামের মত।)

(নয়) কোন ব্যক্তি যদি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হয়ে গেছে মনে করে পানাহার করে বা স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার সাওম ভেঙ্গে যাবে এবং তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। এটা চার ইমামসহ জমহুর ওলামাদের মত।

(দশ) শিঙ্গা বা রক্তদানের জন্য রক্ত বের করা। যার ফলে দূর্বল হয়ে পড়ার আশংকা আছে সেক্ষেত্রে ইমাম আহমদ (র:) এবং অধিকাংশ সালাফী ফকীহগণের মতে সাওম ভেঙ্গে যাবে। দলীল:

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُــومُ (سنن أبي داود)

অর্থ: "সাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে শিঙ্গা লাগায় এবং যাকে শিঙ্গা লাগানো হয় তাদের উভয়ের সাওমই ভেঙ্গে যাবে।"[৩৮]

তবে পরীক্ষা করার জন্য সামান্য রক্ত বের করলে বা যখম ও নাক থেকে অনিচ্ছাকৃত রক্ত বের হলে সাওম ভঙ্গ হবে না।

হানাফী মাযহাব মতে শিঙ্গা লাগানোর দ্বারা কোন অবস্থাতেই সাওম ভঙ্গ হবে না। তবে দূর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে মাকরূহ হবে। তাদের দলীল নিম্নের হাদীসটি:

---

[৩৭] ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৪৪।
[৩৮] সুনানে আবু দাউদ ২৩৬৯; হাদিসটি সহীহ।

عن ثابت البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهـــون الحجامـــة للصائم ؟ . قال لا إلا من أجل الضعف (صحيح البخاري)

অর্থ: "সাবেত (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি আনাস (রা:) কে জিজ্ঞেস করা হলো তোমরা কি সায়েমের জন্য শিঙ্গা লাগানোকে মাকরূহ মনে কর? তিনি বললেন না ! তবে দূর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে (মাকরূহ হবে)।"[৩৯] তাছাড়া রাসূল (সা:) নিজেও সায়েম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم النبي صلى الله عليه و سلم وهـــو صائم (صحيح البخاري)

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) সায়েম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।"[৪০] অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْــرِمٌ صَــائِمٌ (مسند أحمد)

অর্থ: অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) এহরাম অবস্থায় এবং সায়েম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।[৪১]

(এগার) শরীয়ত অনুসারে সুবহে সাদিক হতে সাওম শুরু হয়, কাজেই সুবহে সাদিক না হওয়া পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী ব্যবহার ইত্যাদি সব যায়েজ আছে। অনেকে শেষরাত্রে সেহরী খাওয়ার পর এবং সাওমের নিয়্যাত করার পর রাত্রি থাকা সত্ত্বেও কিছু খাওয়া-দাওয়া বা স্ত্রী ব্যবহার করাকে না জায়েজ মনে করেন, এটা ভুল। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সব জায়েজ আছে, নিয়্যাত করুক বা না করুক। তবে সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হলে এসব না করাই উচিত।

(বার) সাওম অবস্থায় সুরমা বা তেল লাগানো অথবা খুশবুর ঘ্রাণ নেয়া জায়েজ আছে। এমন কি চোখে সুরমা লাগালে যদি থুথু কিংবা শ্লেষ্মায় সুরমার রং দেখা যায়, তবুও সাওম ভঙ্গ হবে না, মাকরুহও হবে না।

---

[৩৯] সহীহ বুখারী ১৮৩৮।
[৪০] সহীহ বুখারী ১৮৩৭।
[৪১] মুসনাদে আহমদ ১৮৪৯।

(তের) সাওম অবস্থায় দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে শোয়া, হাত লাগান বা পেয়ার করা সমস্তই জায়েজ। কিন্তু যদি কামভাব প্রবল হয়ে স্ত্রী সহবাসের আশংকা হয়, তবে এরূপ করা মাকরুহ।

(চৌদ্দ) আপনা আপনি যদি হলকুমের মধ্যে মাছি, ধোঁয়া বা ধুলা চলে যায়, তবে এর দ্বারা সাওম ভঙ্গ হয় না। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক এরূপ করলে সাওম ভেঙ্গে যাবে।

(পনের) লোবান বা আগরবাতি জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া গ্রহণ করলে সাওম ভেঙ্গে যাবে। একইভাবে যদি কেউ বিড়ি-সিগারেট অথবা হুক্কার ধোঁয়া পান করে তবে তার সাওম ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু গোলাপ, কেওড়া ফুল, আতর ইত্যাদি যেসব খোশবুতে ধোঁয়া নেই, তার ঘ্রাণ নিতে কোনো সমস্যা নেই।

(ষোল) সায়েম ব্যক্তি যদি নিজের থুথু বা কফ্ মুখের ভিতরে থেকেই গিলে ফেলে তা যত বেশীই হোক না কেন তাতে সাওমের কোন ক্ষতি হবে না।

(সতের) রাত্রে যদি গোসল ফরজ হয় অথবা হায়েজ ও নেফাস বিশিষ্ট্য নারী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয় তাহলে সুবহে সাদিকের পূর্বেই গোসল করে নেয়াা উচিত। কিন্তু যদি কেউ গোসল করতে দেরী করে, কিংবা সারাদিন গোসল নাও করে, তবে সাওমের কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য ফরজ গোসল অকারণে দেরীতে করলে তার জন্য পৃথক গুনাহ হবে।

(আঠারো) নাকের শ্লেষ্মা জোরে টানার কারণে যদি হলকুমে চলে যায়, তবে তাতে সাওমের কোন ক্ষতি হবে না।

(উনিশ) কুলি করার সময় যদি (অসতর্কতাবশত: সাওমের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও) হলকুমের মধ্যে পানি চলে যায়, (অথবা ডুব দিয়ে গোসল করার সময় হঠাৎ নাক বা মুখ দিয়ে পানি হলকুমের ভিতর চলে যায়) তবে সাওম ভেঙ্গে যাবে। (তবে পানাহার করতে পারবে না) এই সাওম কাজা করা ওয়াজিব, কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব নয়।

(বিশ) সাওম অবস্থায় দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে এমন কি পুরুষের খৎনা করা স্থান স্ত্রীর যোনিদ্বারে প্রবেশ করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক সাওম ভেঙ্গে যাবে। কাযা এবং কাফফারা উভয়টাই ওয়াজিব হবে।

(একুশ) সাওম অবস্থায় ইনজেকশন নিলে সাওম ভাঙ্গবে না। কারণ সাওম ভাঙ্গার জন্য শর্ত হলো পেটে বা মস্তিষ্কে স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে অর্থাৎ নাক, কান, গলা বা পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ইচ্ছাপূর্বক কোন কিছু প্রবেশ বা দাখিল হওয়া। এটাই শরিয়তের বিধান। ইনজেকশন দ্বারা যেহেতু স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পেটে বা মস্তিষ্কে কোন কিছু প্রবেশ করে না তাই সাওমের কোন ক্ষতি হবে না।

উল্লেখ্য যে, শরীরে কোন কিছু প্রবেশ করলে বা করালেই সাওম ভাঙ্গবে না। যেমন ওজু বা গোসল করলে অথবা শরীরে তেল মালিশ করলে পানি ও তেল শরীরে কিছু কিছু প্রবেশ করে। যার ফলে গরমের সময় গোসল করলে শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। অনেক সময় ক্ষুধাও নিবারণ হয়ে যায়। কিন্তু এর মাধ্যমে সাওম ভাঙ্গে না। সুতরাং ইনজেকশন এর মাধ্যমেও সাওম ভাঙ্গবে না যদিও এর দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ বা পিপাসা দূর হয়েছে বলে মনে হয়।

(বাইশ) উল্লেখ্য যে, সিয়াম অবস্থায় সন্তানকে দুগ্ধদানকারী মহিলারা বাচ্চাকে দুধ পান করালে এতে তার সওম ভঙ্গ হবে না এবং কোন রমজানের কোন ক্ষতিও হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা:

যে সব কারণে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে এবং কাজা ও কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে

জমহুর ওলামাদের মতে শুধুমাত্র রমজান মাসে ইচ্ছাকৃত স্ত্রী সহবাস করলে কাযা এবং কাফফারা উভয়টাই ওয়াজিব হবে। এটা সিয়াম অবস্থায় সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ। সিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে ফরজ-নফল সব ধরণের সিয়ামই ভেঙ্গে যাবে। তবে নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক (র:) এর মতে শুধুমাত্র কাযা আদায় করতে হবে কারণ তাদের মতে নফল শুরু করলে ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম আহমদ, শাফেয়ী, ইসহাক প্রমুখ আলেমদের মতে কাযাও আদায় করতে হবেনা কারণ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شـــاء أفطـــر (رواه ابـــو داود و الترمذي و النسائي)

অর্থ: "নফল সওম পালনকারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইচ্ছে করলে রাখতে পারে আর ইচ্ছে করলে ভাঙ্গতে পারে।"[৪২]

তবে কাযা করে নেয়াটাই উত্তম। আর রমযানের ফরজ সিয়ামের ক্ষেত্রে কাযা সহ কাফফারা আদায় করতে হবে। কাফফারা আদায় করার পদ্ধতির ব্যাপারে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:-

عن أبي هريرة رضي الله عنه : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقـــال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان . فقال أتجد ما تحرر رقبة قـــال لا قـــال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا . قال فأطعمـــه أهلك (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একব্যক্তি নবী (সা:) এর কাছে এসে বলল, এই হতভাগা স্ত্রী সহবাস করেছে রমজানে। তিনি বললেনঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে পারবে? লোকটি

[৪২] আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী।

বলল, না। তিনি বললেনঃ তুমি কি ক্রমাগত দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেনঃ তুমি কি ষাটজন মিসকিন খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না।

এমতাবস্থায় নবী (সা:) এর নিকট এক 'আরাক' অর্থাৎ এক ঝুড়ি খেজুর এলো। নবী (সা:) বললেন, এগুলো তোমার তরফ থেকে লোকদেরকে আহার করাও। লোকটি বলল, আমার চাইতেও অধিক অভাবগ্রস্থ কে? অথচ মদীনার উভয় 'লাবার' অর্থাৎ হাররার মধ্যবর্তী স্থলে আমার পরিবারের চাইতে অভাবগ্রস্থ কেউ নেই। নবী (সা:) বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খাওয়াও।[৪৩]

হানাফি মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি রমজানের সাওমের নিয়্যাত করার পর দিনের বেলায় শরীয়তে গ্রহণযোগ্য কোন ওজর ব্যতিত যেকোনভাবে সাওম ভেঙ্গে ফেললে তার উপর কাজা এবং কাফফারা উভয়টাই ওয়াজিব হবে।[88]

সাওমের আদবসমূহ

প্রশ্ন: সাওমের আদব সমূহ কি কি?

উত্তর: (১) السحور সাহ্‌রী খাওয়া।

সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে সাহ্‌রী খাওয়া মুস্তাহাব। তবে সাহ্‌রী না খেলে কোন গুনাহ হবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أَنَسَ بْنَ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـــسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً (صحيح البخاري)

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা সাহ্‌রী খাও কেননা সাহ্‌রীর মধ্যে রয়েছে বরকত।"[৪৫]

প্রশ্ন: সাহরী কি পরিমান খেতে হবে?

[৪৩] সহীহ বুখারী ১৮১৩ নং হাদীস; সুনানে নাসায়ী ৩১১৮ নং হাদীস; মুসনাদে আহমদ ৬৯৪৪ নং হাদীস।

[88] বেহেশতী জেওর ১ম খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠা।

[৪৫] সহীহ বুখারী ১৯২৩; সহীহ মুসলিম ২৬০৩।

উত্তর: সাহরী অল্পও খাওয়া যাবে বেশীও খাওয়া যাবে এমনকি একঢোক পানি খেলেও সাহরীর হক আদায় হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن أبي سعيد الخدري قال:–قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين (المسند للإمام أحمد بن حنبل)

অর্থ: আবূ সায়ীদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, সাহরী একটি বরকতময় খাদ্য, তোমরা ইহা ছেড়ে দিও না যদিও তা এক ঢোক পানি দ্বারা হয়। কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:) ও তাঁর ফেরেশতাগণ সাহরীগ্রহণকারীদের প্রতি 'সালাত' নাজিল করেন। [৪৬]

প্রশ্ন: সাহরী খাওয়ার সময় কখন হয়?

উত্তর: সাহরী খাওয়ার সময় হলো মধ্যরাত থেকে শুরু করে সুবহে সাদিক এর পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত। তবে বিলম্ব করে (সুবেহ সাদিকের পূর্বে) খাওয়া মুস্তাহাব। হাদীসে এরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ (مسند أحمد)

অর্থ: "রাসুল সা. বলেন, আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা দ্রুত (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে এবং দেরিতে (ফজরের পূর্ব মুহূর্তে) সাহুর খাবে।" [৪৭] তিনি আরোও বলেন,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً (صحيح البخاري)

অর্থ: "যায়েদ ইবনে সাবেত (রা:) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাথে সাহরী খেলাম এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞেস

[৪৬] মুসনাদে আহমদ ৯/৩১।

[৪৭] ইবনে মাজাহ, আহমদ, সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনে বুখারী ও মুসলিম।

করলাম আযান এবং সাহরীর মাঝে কতটুকু সময় পার্থক্য ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত (তেলাওয়াত করা) পরিমাণ।"[৪৮]

ইফতার করার মাসায়িল

প্রশ্ন: ইফতার কখন করবে?

উত্তর: সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা উত্তম। এব্যাপারে মহানবী সা. তার হাদীসে ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ » (سنن أبي داود)

অর্থ: "দ্বীন ততকাল পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে মানুষ যতকাল দ্রুত ইফতার করবে। কেননা ইয়াহুদী খৃষ্টানরা দেরী করে ইফতার করে।[৪৯]

সাহাবায়ে কিরামগণও এই আমল করতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن عمرو بن ميمون قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا (سنن البيهقي الكبرى)

অর্থ: আমর ইবনে মাইমূন (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা:) এর সাহবীগণ ইফতার করার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে দ্রুত করতেন আর সাহরী খাওয়ার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে বেশী বিলম্ব করে খেতেন।[৫০]

(২) تعجيل الفطر সূর্যাস্তের সাথে সাথে দ্রুত ইফতার করা

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (بخاري ومسلم)

অর্থ: "সাহাল ইবনে সাআদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত রাসুল সা. বলেন, মানুষ ততকাল কল্যাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতকাল তারা দ্রুত ইফতার করবে।"[৫১]

[৪৮] সহীহ বুখারী ১৯২১; সহীহ মুসলিম ২৬০৬।

[৪৯] আবূ দাউদ ২৩৫৫।

[৫০] সুনানে বাইহাকী ৭৯১৬।

[৫১] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ইফতার করার সময় কয়েকটি বেজোড় খেজুর দিয়ে শুরু করা উত্তম। তা না হলে শুধু পানি। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

অর্থ: "আনাস (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সা. সালাতের পূর্বে কয়েকটি আধাপকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পাওয়া গেলে পাকা শুকনো খেজুর দিয়ে, তা না পাওয়া গেলে শুধু পানি দিয়ে ইফতার করতেন।"[৫২]

প্রশ্ন: ইফতার কখন করতে হবে? সূর্যাস্তের সাথে সাথে না তারকা উদয় হলে?

উত্তর: সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইফতারির সময় হয়ে যায়। কেননা :

(ক) মাগরিবের সালাতের সময় সম্পর্কে সকলেই একমত যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাগরিবের সময় হয়ে যায়। আর মাগরিবের সালাতের সময় বর্ণনা করতে গিয়ে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَمَّنِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ...وَصَلَّى بِىَ – يَعْنِى الْمَغْرِبَ – حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

(سنن أبي داود للسجستاني)

অর্থ : "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, জিবরাইল (আ:) দুই দিন পর্যন্ত বাইতুল্লাহর সামনে আমার ইমামতি করেছেন এবং আমাকে মাগরিবের সালাত পড়ালেন যখন সায়েম (সিয়াম পালনকারী) ইফতার করে।[৫৩] এই হাদীসে মাগরিবের সালাতের সময় ও ইফতারের সময় একই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর এ ব্যাপারে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত যে মাগরিবের সময় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায়। মুসলিম শরিফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

[৫২] আবু দাউদ ২৩৫৮।
[৫৩] অবুদাউদ ৩৯৩ ।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.(صحيح مسلم للنيسابوري)

অর্থ: সালামা বিন আক'ওয়া (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) সূর্য অস্তমিত হয়ে অদৃশ্য হলেই রাসূলুল্লাহ (সা:) মাগরিবের সালাত পড়তেন।[৫৪]

সুতরাং সূর্য অস্তমিত হয়ে অদৃশ্য হলেই ইফতারের সময় হয়ে যাবে।

(খ) রাসূলুল্লাহ (সা:) মাগরিবের সালাতের পূর্বেই ইফতার করে মাগরিবের সালাত আদায় করতে যেতেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

অর্থ: "আনাস (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সা. সালাতের পূর্বে কয়েকটি আধাপকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পাওয়া গেলে পাকা শুকনো খেজুর দিয়ে, তা না পাওয়া গেলে শুধু পানি দিয়ে ইফতার করতেন।"[৫৫]

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইফতার করে মাগরিবের সালাত আদায় করার জন্য যেতেন। অত:এব ثم اتموا الصيام الي الليل "অত:পর তোমরা রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।" এরভুল ব্যাখ্যা করে মাগরিবের সালাতের পরে ইফতার করতে হবে এটা কুরআন, সুন্নাহ ও সমস্ত মুসলিমদের ইজমার পরিপন্থি। রাসূলুল্লাহ (সা:) মাগরিবের সালাতের পরে ইফতার করেছেন এর কোন প্রমাণ নেই। তবে হ্যা! রাসূলুল্লাহ (সা:) মাগরিবের সালাতের আগে এক দুইটি খেজুর খেয়ে অথবা শুধু পানি পান করে সালাত আদায় করতেন। মাগরিবের পরে প্রয়োজনীয় খাবার খেতেন। মূলত কুরআন, সুন্নাহর থেকে অজ্ঞ, বয়সে কম, বুদ্ধিবিবেচনায় অপরিপক্ক, কুরআন সুন্নাহর ইলমের ক্ষেত্রে অসহায়-মিসকিন তারাই কেবল কুরআনের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে কিছু নিরীহ, সরলমনা মুসলিম যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করছে।

[৫৪] সহীহ মুসলিম ১৩২৫
[৫৫] আবু দাউদ ২৩৫৮।

বিভ্রান্তির উৎস

প্রশ্ন: যারা রাতের বেলা ইফতার করার কথা বলেন তাদের এই বিভ্রান্তির উৎস কি?

উত্তর: মূলত: তারা কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত

ثم اتموا الصيام الي الليل

অর্থ: "তোমরা সিয়ামকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ কর।" এই আয়াতের মধ্যকার الليل শব্দের অর্থ ভুল বোঝার কারণেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কারণ সূর্যাস্তের পরবর্তী সময়কে লাইল বলা হয়না বরং তাকে বলা হয় اصيل বা 'সন্ধ্যা'। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে:

{وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الأحزاب: ৪২]

অর্থ: "আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর কর।"[56]

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দেন যে,

{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الرعد: ১৫]

অর্থ: "আর আল্লাহর জন্যই আসমানসমূহ ও যমীনের সবকিছু অনুগত ও বাধ্য হয়ে সিজদা করে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের ছায়াগুলোও"।[৫৭]

উপরোক্ত দুটি আয়াতে সন্ধ্যাবেলাকে বুঝানোর জন্য اصال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যদি সিয়ামের শেষ সময় সূর্যাস্তই হতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা বলতেন "তোমরা সিয়ামকে সন্ধ্যা (اصيل) পর্যন্ত পূর্ণ করো।" বলতেন। "রাত পর্যন্ত পূর্ণ কর" বলতেন না। যখন রাত পর্যন্ত বলা হয়েছে তখন সন্ধ্যার সময় ইফতার করলে তো সাওম বাতিল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: রাতের বেলা ইফতার করার প্রবক্তাদের উপরোক্ত বিভ্রান্তির সঠিক সমাধান কি?

উত্তর: মূলত: লাইল শব্দের অর্থের ব্যাপারে তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের সূচনাই হয়েছে আরবী ভাষা ও কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা

[৫৬] সুরা আহযাব ৪২।
[৫৭] সুরা রাআ'দ ১৫।

থেকে। নতুবা কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষার বহু জায়গায় সূর্যাস্তের সময়কে রাতের আগমন বলা হয়েছে যেমন :

{وَالضُّحَى (১) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى } [الضحى: ১، ২]

অর্থ: "কসম পূর্বাহ্নের, কসম রাতের যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।"[৫৮]

এখানে "কসম রাতের" পরে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। বুঝা গেল রাত হওয়ার জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া জরুরি নয়। যদি তাই হতো তাহলে শুধু রাতের কসম করলেই হত اذا سجي বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। এমনি ভাবে কুরআনে বলা হয়েছে: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: ১] অর্থ: " কসম রাতের, যখন তা ঢেকে দেয়।" এ আয়াতেও বুঝা গেল, রাত হলেই অন্ধকারে ঢেকে দেওয়া জরুরি নয়। সে কারণেই "যখন তা অন্ধকারে ঢেকে যায়" বলা হয়েছে। এমনিভাবে হাদীসেও সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেই রাত্র হয়ে যায় বলে প্রমান আছে। হাদীস:

عَنْ عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (صحيح البخاري)

অর্থ: ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যখন রাত্র যখন রাত্র সে দিক থেকে ঘণিয়ে আসে ও দিন এ দিক থেকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন সায়িম ইফতার করবে।[৫৯]

এই হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে, যখন সূর্য ডুবে যায় তখনই ইফতার করবে।

ইমাম বূখারী এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেই 'তরজমাতুল বাবে' উল্লেখ করেছেন :

وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ (صحيح البخاري)

অথ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) যখন সূর্যের গোলাকার বৃত্ত ডুবে যেত তখনই ইফতার করতেন।[৬০] পর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

[৫৮]সুরা আদ্-দুহা ১-২।
[৫৯] সহীহ বুখারি ১২২৫।

عن عَبْدَ اللَّه بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِه قِبَلَ الْمَشْرِق (صحيح البخاري)

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সঙ্গে রওয়ানা দিলাম এবং তিনি সায়েম ছিলেন। সূর্য অস্ত যেতে তিনি বললেন: তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর একটু সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি বললেন, তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখনো তো আপনার সামনে দিন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তারপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং ছাতু গুলিয়ে আনলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা:) আঙ্গুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে বললেন: যখান তোমরা দেখবে যে, রাত এদিক থেকে আসছে, তখনই রোযাদারের ইফতার সময় হয়ে গেল।[৬১]

(৩) الدعاء عند الفطر ইফতারির সময় দু'আ

ইফতারের সময় দু'আ কবুল হয়। হাদীসে এসেছে,

عن عمرو بن العاص يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد) سنن ابن ماجه

অর্থ: "আমর ইবনুল আস (রা:) হতে বর্ণিত; রাসুল সা. ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই ইফতারের সময় সায়েম ব্যক্তির দু'আ নিস্ফল হয় না।"[৬২]

ইফতারের পূর্ব মুহূর্তের দু'আ:

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) ইফতারের সময় এই দু'আ পড়তেন।

৬০ সহীহ বুখারি (بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ)

৬১ সহীহ বুখারী ১৮৩২।

৬২ সুনানে ইবনে মাজাহ।

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي

অর্থ: "হে আল্লাহ আমি তোমার বিশ্বময় প্রসস্থ রহমতের উসিলায় তোমার কাছে আবেদন করি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।"[৬৩]

রাসুল সা. নিজে ইফতার করার সময় এই দু'আ করতেন,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (سنن أبي داود للسجستاني)

মুআ'জ ইবনে জুহরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, তাকে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন ইফতার করার ইচ্ছা করতেন তখন এই দো'আ করতেন اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ অর্থ 'হে আল্লাহ আমি তোমার উদ্দেশ্যেই সাওম পালন করেছি এবং তোমার দেওয়া রিজিক দিয়েই ইফতার করছি।[৬৪]

ইফতার করার পরের দু'আ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) ইফতার করার পরে এই দু'আ করতেন,

عن ابن عمر رضي الله تعالي عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (سنن أبي داود للسجستاني)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) ইফতার করার পরে বলতেন,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

অর্থ: পিপাসা মিটে গেছে, শিরা-উপশিরা ভিজে তরুতাজা হয়েছে এবং আল্লাহ চাহে তো সওয়াবও নিশ্চিত হয়েছে।"[৬৫]

(৪) মেসওয়াক করা

সায়েম ব্যক্তির জন্য সিয়াম অবস্থায় সকাল-বিকাল সব সময় মেসওয়াক করা উত্তম। রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

৬৩ ইবনে মাজাহ ১৭৫৩।

৬৪ সুনানে আবু দাউদ/২৩৬০ হাদীসটি মুরসাল।

৬৫ সুনানে আবূ দাউদ/ ২৩৫৯।

عَنْ زَيْد بْنِ خَالد الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ». (سنن أبى داود – ج ١ / ص ١٧)

অর্থ: "যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুল সা.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন হবে বলে আশংকাবোধ না করতাম তাহলে প্রতি সালাতের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।" [৬৬]

এই হাদীসে বর্ণিত **"প্রতি সালাত"** এর মধ্যে রমজান মাসের যোহর ও আসরের সালাতও অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং রমজান মাসের বিকেলে মেসওয়াক করাতেও কোন অসুবিধা নেই। রাসুল সা. নিজেও সিয়াম অবস্থায় মেসওয়াক করতেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيه قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ مَا لَا أَعُدُّ وَمَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ (مسند أحمد)

অর্থ: "আমের ইবনে রাবিয়া (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুল সা.কে অসংখ্যবার সিয়াম অবস্থায় মেসওয়াক করতে দেখেছি।" [৬৭]

যারা বলে সিয়াম অবস্থায় দিনের বেলায় মেসওয়াক করা অনুচিত তারা মূলতঃ "সায়েম ব্যক্তির মূখের দুর্গন্ধ মেশক্ আম্বরের চেয়ে উত্তম।" এই হাদীসের মর্ম না বুঝে বিভ্রান্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ হাদীসে মেসওয়াক না করার কারণে মূখে যে, দুর্গন্ধ হয় তাকে মেশক্ আম্বরের মত বলা হয় নি। বরং সাওম রাখার কারণে পাকস্থলী থেকে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় সেটাকে মেশক্ আম্বরের সুগন্ধির চেয়েও আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয় বলা হয়েছে।

(৫) সিয়ামের জন্য ক্ষতিকর কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা

সিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ন ইবাদত। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা। মানুষের আত্মিক, চারিত্রিক উন্নতি সাধনের সর্বোত্তম সোপান। সে

[৬৬] আবু দাউদ ৪৭।
[৬৭] মুসনাদে আহমদ ১৫৬৭৮।

কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটিকে ক্ষতিকর বস্তু থেকে হেফাজত করার জন্য বেশী যত্নবান হওয়া উচিত। যাতে করে সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য 'তাকওয়া' অর্জন করা ব্যাহত না হয়। এ জন্য নিম্ন বর্ণিত অন্যায় কাজগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত।

(ক) মিথ্যা কথা বলা ও অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকা

হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَـمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (صـحيح البخاري)

অর্থ: আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করা সত্ত্বেও মিথ্যা কথা ও হারাম কাজ ত্যাগ করতে পারল না। তার খাবার-দাবার পরিত্যাগ করার ব্যাপারে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।[৬৮]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من صائم ليس لـه مـن صيامه الا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر (سنن الدارمي لعبدالله الدارمي)

অর্থ: "আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, অনেক সায়েম এমন আছে যার ভাগ্যে ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া অন্য কিছুই নাই। অনেক রাত্রি জাগরণ করে ইবাদতকারী আছেন যাদের ভাগ্যে রাত্রি জাগরণ ব্যতিত আর কিছুই নাই।"[৬৯]

(খ) কোন মুসলিম ভাইয়ের গীবত করা থেকে বিরত থাকা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًـا فَكَرِهْتُمُـوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: ১২]

[৬৮] সহীহ বুখারী ১৯০৩।
[৬৯] সুনানে দারমী ২/৩০১, হাদীসটি সহীহ।

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।"[৭০]

(গ) ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হওয়া

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس الصيام من الأكل و الشرب إنما الصيام من اللغو و الرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل : إني صائم إني صائم (صحيح ابن خزيمة)

অর্থ: "আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: খানাপিনা থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম নয়। বরং অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকাই (প্রকৃত) সিয়াম। যদি তোমাকে কেউ গালি দেয় অথবা মূর্খ সুলভ অভদ্র আচরণ করে তবে তুমি তাকে জানিয়ে দাও যে, নিশ্চয়ই আমি সায়েম, নিশ্চয়ই আমি সায়েম।"[৭১]

(ঘ) হাসাদ বা পরশ্রীকাতরতা বর্জন করা

হাদীসে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (سنن أبي داود)

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত রাসুল সা. ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই হাসাদ (পরশ্রীকাতরতা) মানুষের নেক আমলগুলো খেয়ে ফেলে যেরকমভাবে আগুন শুকনো লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে (জ্বালিয়ে দেয়)।"[৭২]

(ঙ) কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা ও দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা থেকে বিরত থাকা

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } [الحجرات: ১২]

[৭০] সুরা হুজুরাত ১২।

[৭১] সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৯৯৬।

[৭২] আবু দাঊদ ৪৯০৩।

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু। (সুরা হুজরাত: ১২)

(চ) কাউকে নিন্দা করা ও বিদ্রূপ করা থেকে বিরত থাকা

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুব: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات: ১১]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীনীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।" (সুরা হুজুরাত: ১১)

ফাজায়েলে সাওম:

প্রশ্ন: সাওম পালন করার ফজীলত কী?

উত্তর: কুরআন হাদীসে সাওম পালন করার অনেক ফযিলত রয়েছে।তার মধ্য হতে নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা করা হল।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى (االبخاري و مسلم)

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী (সা:) বলেছেন মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কিন্তু সাওম

আমারই জন্য। এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করবো।' বান্দাহ আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।"[৭৩](পূর্বে এর বিস্তারিত ব্যখ্যা করা হয়েছে)[৭৪]

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصِّيَامُ جُنَّةٌ (رواه البخاري و مسلم)

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ।"[৭৫]

সাওমের ফযিলত সম্পর্কে আরো একটি হাদীস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ (رواه الحاكم بسند صحيح)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, কুরআন এবং সিয়াম কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে হে আমার রব! আমি তোমার বান্দাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা এবং কামভাব থেকে বিরত রেখেছি সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে আমি তাকে রাতের বেলায় নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। অতপর উভয়ের সাক্ষি গ্রহণ করা হবে।"[৭৬]

প্রশ্ন: সায়েমকে কি প্রতিদান দেওয়া হবে?

উত্তর: সায়েম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ (সুব:) অসংখ্য পুরুস্কার ঘোষণা করেছেন। তার থেকে কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হল:

[৭৩]বুখারী ও মুসলিম।

[৭৪] সহীহ বুখারী /৬৯৮৪ ; সহীহ মুসলিম /২৫৭৩ ; সুনানে নাসাঈ /২২১১ ; সুনানে তিরমিজি /৭৬১; সনানে ইবনে মাজাহ ১৬৩৮।

[৭৫] সহীহ মূললিম ২৫৭১; সহীহ বুখারী ১৭৯৫; আবু দাউদ ২৩৬৫;

[৭৬] মুসতাদরাকে হাকেম ২০৩৬; বাইহাকি ১৯৯৪।

১. সায়েম (সিয়াম পালনকারী) এর প্রতিদান দিবেন স্বয়ং আল্লাহ (সুব:)

হাদীসের মাঝে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى (رواه البخاري و مسلم)

অর্থ: "আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী (সা:) বলেছেন, "মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "কিন্তু রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করবো। (পূর্বে এর বিস্তারিত ব্যখ্যা করা হয়েছে) বান্দাহ আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।"[৭৭]

২. সায়েম (রোজাদার) এর জন্য জান্নাতের স্পেশাল গেট:

বুখারী ও মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ (رواه البخاري و مسلم)

অর্থ: "সাহাল ইবনে সা'দ (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী (সা:) বলেন, জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে

[৭৭] সহীহ বুখারী /৬৯৮৪ ; সহীহ মুসলিম /২৫৭৩ ; সুনানে নাসাঈ /২২১১ ; সুনানে তিরমিজি /৭৬১; সনানে ইবনে মাজাহ ১৬৩৮।

প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে।"[৭৮]

৩. সায়েমের মুখের দুর্গন্ধ যা ক্ষুধার কারণে হয়ে থাকে তা আল্লাহর কাছে মিশক-আম্বরের চেয়েও অধিক প্রিয়

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস

عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم ...وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

অর্থ: "আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয়ই রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও উত্তম হবে।"[৭৯]

৪. সায়েম (রোজাদার) এর জন্য দুটি আনন্দময় মুহূর্ত

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليــه وســلم... لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.

অর্থ: "আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী (সা:) বলেছেন, রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি তার রব আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়।"[৮০]

৫. সায়েম ব্যক্তি শয়তানের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকে

কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, 'সিয়াম ঢাল' সুতরাং সিয়াম অবস্থায় যেন কেউ অশ্লীল কথা

[৭৮] সহীহ বুখারী ১১৮৬; মুসলিম ২৫৭৬

[৭৯] সহীহ বুখারী ৬৯৮৪; মুসলিম ২৫৭২

[৮০] সহীহ বুখারী /৬৯৮৪ ; সহীহ মুসলিম /২৫৭৩ ; সুনানে নাসাঈ /২২১১ ; সুনানে তিরমিজি /৭৬১; সনানে ইবনে মাজাহ ১৬৩৮।

বার্তা ও বেহায়াপনা কাজে লিপ্ত না হয়। কেউ যদি তার সঙ্গে লড়াই করতে চায় অথবা তাকে গালিগালাজ করে তাহলে যেন বলে 'আমি সায়েম' একথা দুইবার বলবে। যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি! নিশ্চয়ই সায়েম ব্যক্তির মুখের দুর্গন্ধ (যা সিয়ামের কারণে পাকস্থলি থেকে তৈরি হয়) আল্লাহর কাছে মেশক আম্বরের সুগন্ধির চেয়েও অধিক প্রিয়। কেননা সে খাদ্য, পানীয় এবং কামনা-বাসনা আমার জন্যই ত্যাগ করে।"[৮১]

এই হাদীসে সাওমকে ঢালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর মর্মকথা হচ্ছে, ঢালের সাহায্যে যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করে আত্মরক্ষা করা হয়, তেমনিভাবে সিয়ামের মাধ্যমে সকল প্রকার শয়তানদের আক্রমণ প্রতিহত করে আত্মরক্ষা করা যায়। এজন্যই হাদীসের শেষ অংশে বলা হয়েছে, যদি কেউ তার সঙ্গে লড়াই করতে চায় অথবা তাকে গালি গালাজ করে তাহরে সে বলে দিবে 'আমি সায়েম'। এভাবে এই ঢালকে ব্যবহার করবে।

প্রশ্ন: রমজান মাসের বিশেষ কি ফজীলত রয়েছে?

উত্তর: রমজান মাসের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ফজীলত রয়েছে। তা থেকে বিশেষ কয়েকটি ফজিলত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. এ মাসের সবচেয়ে বড় ফজীলত হলো কুরআন নাজিল হওয়া

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ: "রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।" (সুরা বাকারা: ১৮৫)

২. এ মাসেই রয়েছে লাইলাতুল কদর, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

[৮১] সহীহ বুখারী ১৮৯৪।

{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (১) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (২) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (৩) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (৪) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (৫)} [القدر: ১ – ৫]

অর্থ: নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি 'লাইলাতুল কদরে।'তোমাকে কিসে জানাবে 'লাইলাতুল কদর' কী? 'লাইলাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে। শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত। (সুরা কদর: ১-৫)

সুরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে কোরআন রমযান মাসে নাযিল হয়েছে। অপর দিকে সুরা কদরে বলা হয়েছে যে, কোরআন লাইলাতুল কদরে নাযিল হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে লাইলাতুল কদরও রমযান মাসের মধ্যে।

৩. এ মাসে শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয়

রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــه وَسَـــلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْــسِلَتْ الـــشَّيَّاطِينُ

(صحيح البخاري 8/ ১২৩)

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যখন রমযান মাস আরম্ভ হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়।"[৮২]

৪. এ মাসে প্রতি রাতে অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة مـــن شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها

[৮২] সহীহ বুখারী ৩০৪৭; সহীহ মুসলিম ২৩৬৩; সুনানে নাসাঈ ২০৯৬;

باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادى مناد يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة)

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, রমযান মাসের প্রথম রাত্রে শয়তান এবং ভয়ংকর, দুষ্ট জীনদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের সবগুলো দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় ও জান্নাতের সবগুলো দরজা খুলে দেয়া হয়। একজন ঘোষক ঘোষণা দিতে থাকে, হে সৎকর্মে আগ্রহীব্যক্তিরা! তোমরা অগ্রগামী হও এবং হে অসৎকর্মে আগ্রহীব্যক্তিরা! তোমরা বিরত থাক। এবং আল্লাহ তায়ালা এ মাসের প্রতি রাতেই অনেক লোকদের জাহান্নাহ থেকে মুক্তি দান করেন।"[৮৩]

৫. এ মাসে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়

عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــه وَسَـــلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْــسِلَتْ الـــشَّيَّاطِينُ

(صحيح البخاري 8/ ১২৩)

অর্থ: "আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যখন রমযান মাস আরম্ভ হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়।"[৮৪]

৬. এটি তওবার মাস

এমাসে আল্লাহ (সুব:) অসংখ্য মানুষকে ক্ষমা করেন। হাদীসে এরশাদ হয়েছে:

عن أبي هريرة قال قال رصول الله صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء مـــن النـــار وذلك كل ليلة (رواه الترمذي)

[৮৩] সুনানে তিরমিজী ৬৭৭: সুনানে ইবনে মাজাহ ১৬৪২।

[৮৪] সহীহ বুখারী ৩০৪৭; সহীহ মুসলিম ২৩৬৩; সুনানে নাসাঈ ২০৯৬;

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এ মাসের প্রতি রাতেই অনেক লোকদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।"[৮৫]

এজন্য এমাসে বেশী বেশী তওবা করা উচিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তওবাকারীকে ভালবাসেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলছেন:

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } [البقرة: ২২২]

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তওবাকারীদের ভালবাসেন।"[86]

তওবার মাধ্যমে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

عن أبي عبيدة بن عبد الله ،عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " التائب من الذنب ، كمن لا ذنب له "(سنن ابن ماجة للقزويني)

অর্থ: "যে ব্যক্তি তওবা করে সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে যায় তার কোন পাপ থাকে না।"[87]

যত বড় পাপীই হোক না কেন আল্লাহর দরবার থেকে নৈরাশ হওয়া যাবে না। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر: ৫৩]

অর্থ: "বল! 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আলাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৮]

তিনি আরো সুন্দর করে ঘোষণা করছেন:

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الحجر: ৪৯]

অর্থ: "আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৯] কিন্তু এত সুন্দর করে বলার পরও যখন বান্দা ভয় পাচ্ছে তখন আল্লাহ (সুব:) আরো আদর করে আহবান করছেনঃ

[৮৫] সুনানে তিরমিজী ৬৭৭: সুনানে ইবনে মাজাহ ১৬৪২।
[৮৬] সুরা বাকারা ২২২।
[৮৭] সুনানে ইবনে মাজাহ ১৪২০।
[৮৮] সুরা যুমার ৫৩।
[৮৯] সুরা হিজ্‌র৪৯।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر: ৬০]

অর্থ: "আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (গাফের: ৬০)

এখন বান্দা মনে মনে চিন্তা করে আল্লাহ কি আমার ডাক শুনবেন? আল্লাহ কতদূরে থাকেন কোন ভায়া মাধ্যম ছাড়া কি তিনি শুনেন? আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة: ১৮৬]

অর্থ: "আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয়ই নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।"[৯০]

এবারে বান্দা মনে মনে প্রশ্ন করে যে,আল্লাহ তুমি কতো কাছে আছো? আল্লাহ (সুব:) উত্তর দেন: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [ق: ১৬

অর্থ: আমি বান্দার শাহরগের থেকে নিকটে।[৯১]

সুতরাং প্রতিটি মুমিনের উচিত আল্লাহর কাছে সরাসরি খালেছভাবে তওবা করা। তওবা অর্থ হচ্ছে 'বারবার ফিরে আসা' অর্থাৎ অতীতের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, ভবিষ্যতে কোন গুনাহ না করার আঙ্গীকার করা এভাবে যদি বারংবার গুনাহ হয়ে যায় অতঃপর সে তওবা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم: ৮]

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালা নিকট তওবা কর।"[৯২]

[৯০] সুরা বাকারা/১৮৬।
[৯১] সুরা ক্বাফ/১৬।
[৯২] সুরা তাহরীম ৮

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, কুরআনুল কারীমে এত সুন্দরভাবে আল্লাহ (সুব:) সকল পাপীদেরকে **'তওবার ডাক'** দেওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পীর, ফকির, মাজারওয়ালা, খাজাবাবা, লেংটাবাবা, গাঁজাবাবাদের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে। আল্লাহ (সুব:) খুব কঠোরভাবে তাদের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } [فاطر: ১৫]

অথ: "হে মানুষ, তোমরা আলাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আলাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।"[৯৩]

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) দুনিয়ার সকল মানুষকে ফকির বলে ঘোষণা করেছেন। পীর-মুরীদ, আমীর-গরীর, রাজা-প্রজা, ইমাম-মুক্তাদী, খাজাবাবা- গাঁজাবাবা, মাজারওয়ালা, বাজারওয়াল, দরগাহওয়ালা- দূর্গা ওয়ালা সকলেই ফকীর। ধনী একমাত্র আল্লাহ (সুব:)। এখানে আল্লাহ ছাড়া সকলকে ফকীর বলার রহস্য এই যে, দুনিয়ার ফকীরদের নিয়ম হলো তারা একজন ফকীর আরেকজন ফকীরের কাছে ভিক্ষা চায় না। কারণ তারা জানে যে, সেও যেরকম ভিক্ষুক ঐ ব্যক্তিও ঠিক সেরকমই ভিক্ষুক। আর একজন ভিক্ষুক আরেকজন ভিক্ষুককে সাহায্য করতে পারে না। এ বিষয়টিকেই আল্লাহ (সুব:) অন্য একটি আয়াতে এরশাদ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [الأعراف: ১৯৪]

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে তারা যেনো তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়।" (সুরা আ'রাফ: ১৯৪) সুতরাং আসুন আমরা রমজানের এই তওবার মাসে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই তওবা করি, ক্ষমা চাই, প্রার্থণা করি।

৭. এটি জিহাদের মাস

[৯৩] সুরা ফাতের ১৫।

এ মাসেরই ১৭ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ এবং এ মাসেই সংঘটিত হয়েছিল ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরিফে বর্ণিত হয়েছে:

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غزا غزوة الفتح في رمضان (رواه البخاري)

অর্থ: "উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) রমজান মাসে মক্কা বিজয়ের অভিযান পরিচালনা করেছেন।"[৯৪]

মূলত: সিয়ামের একটি বড় উদ্দেশ্য হল জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। জিহাদ করতে গেলে পাহাড়ে-পর্বতে, মাঠে-ময়দানে, সমূদ্রে-জঙ্গলে খেয়ে না খেয়ে চরম ক্ষুধা নিয়েও যুদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা:) সহ সাহাবায়ে কিরাম পেটে পাথর বেধে ছিলেন। কোন কোন যুদ্ধে সাহ্াবায়ে কিরাম গাছের পাতা খেয়ে। আবার কোন যুদ্ধে একটা খেজুর কয়েকজনে ভাগ করে খেয়ে। আবার কখনো লাগাতার কয়েকদিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে। রমজান মাস এমনিতেই একটি মর্যাদাসম্পন্ন মাস। তার মধ্যে আবার ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি 'গাযওয়া' রমজান মাসে হওয়ায় রমজানের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে (**ذروه سنامه الجهاد**) ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ।[৯৫]

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূল (সা) এর কাছে আবেদন করলেন আমাদেরকে এমন কোন আমল বলুন যা জিহাদের সমতুল্য হয়। আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন, না এমন কোন আমল আমি পাইনা। হাদীসটি হলো :

عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সা:) এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন কোন আমল বলুল যা

[৯৪] সহীহ বুখারী ৪০২৬ নং হাদীস।
[৯৫] সুনানে তিরমিজি ১২৫। হাদীসটি সহীহ

জিহাদের সমতুল্য হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) উত্তর দিলেন যে না এমন কোন আমল আমি পাই নি।”[৯৬]

জিহাদের মাধ্যমেই মুমিনদের জান-মাল আল্লাহ (সুব:) জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } **[التوبة: ১১১]**

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতপর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সঙ্গে) যে সওদা করেছো, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।” [৯৭]

এ আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, বেচাকেনা করতে গেলে চারটি জিনিষের প্রয়োজন হয়। এক. ক্রেতা। দুই. বিক্রেতা। তিন. পন্য। চার. মূল্য। এখানে আল্লাহ (সুব:) নিজে হচ্ছেন ক্রেতা। মুমিনরা হচ্ছে বিক্রেতা। মুমিনদের জান-মাল হচ্ছে পণ্য। আর জান্নাত হচ্ছে মূল্য বা বিনিময়। নিশ্চয়ই ক্রেতার কাছে পণ্যের গুরুত্ব মূল্যের চেয়ে বেশী বলেই সে মূল্য দিয়ে পন্য ক্রয় করে। আল্লাহ (সুব) যদিও মুমিনদের জান-মালসহ গোটা সৃষ্টির মালিক তিনিই। তারপরও নিজেকে মুমিনদের জান-মালের ক্রেতা বলে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই গুরুত্ব? তার উত্তর দিয়েছেন আল্লাহ (সুব:) এই আয়াতেরই পরবর্তী অংশে। সেখানে বলা হয়েছে ‘তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অত:পর তারা মারে ও মরে।’ বুঝা গেল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার মাধ্যমেই মুমিনরা তাদের বিক্রয়কৃত জান-মাল ক্রেতা আল্লাহর কাছে হস্তান্তর করে থাকে। যে মালের ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ

[৯৬] সহীহ বুখারী ২৭৮৫।

[৯৭] সুরা তাওবা ১১১।

(সুব:) সে মাল পঁচা, নষ্ট বা নিম্ন মানের হলে চলবে না। সেজন্য যেসব মুমিনদের জান এবং মাল আল্লাহ (সুব:) ক্রয় করেন তাদের কোয়ালিটিগুলো পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আয়াতটি হলো এই:

{التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}

অর্থ: “তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সিজ্‌দাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।” (সুরা তাওবা: ১১২)

এ আয়াতে মুমিনদের ৯টি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের অপর আরেকটি আয়াতে মুমিনদের গুণাবলী সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে:

{الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ}

অর্থ: “যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।” (সুরা আলে ইমরান: ১৭)

এ আয়াতে ৫টি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (১) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (২) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (৩) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (৪) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (৫) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (৮) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (৯) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (১০) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} **[المؤمنون: ১ – ১১]**

অর্থ: “অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, ১.যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত। ২. আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ। ৩. আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। ৪. আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী। ৫. আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান। ৬. আর যারা নিজেদের সালাতসমূহ হিফাযত করে। তারাই হবে ওয়ারিস। যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।” (সুরা মু’মিন: ১-১১)

এ আয়াতে সফলকাম মুমিনদের ৬টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি মুমিনের উচিত মাহে রমজানের এই সুবর্ণ সুযোগে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই সকল গুণাবলী অর্জন করত: নিজেকে আল্লাহর কাছে জিহাদের মাধ্যমে শাহাদাত বরণ করে বিক্রয় করতে সচেষ্ট হওয়া। একারণেই রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও শাহাদাতের তামান্না করতেন। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ(صحيح البخاري)

অর্থ: "আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা:) কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা আমার থেকে কখনো দুরে থাকতে পছন্দ করে না অপরদিকে আমি যে তাদেরকে আমার সাথে যুদ্ধে নিয়ে যাবো সেরকম বাহনের ব্যবস্থাও করতে পারি না (এমন সমস্যা না হলে) আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী কোন 'সারিয়্যা' থেকে অনুপস্থিত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন, আমার খুব ইচ্ছা হয় আমি আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধ করতে করতে) শহীদ হয়ে যাই। আবার জীবিত হই। আবার শহীদ হয়ে যাই। আবার জীবিত হই। আবার শহীদ হয়ে যাই।[৯৮]

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহর নবী (সা:) যেই দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করেছেন বিশেষ করে পবিত্র মাহে রমজানেও বদরের যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ের মত অভিযান পরিচালনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও যুদ্ধ করেছেন। আজকে সেই দ্বীন সর্বত্র লাঞ্চিত, পদদলিত। মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করা হচ্ছে। মুসলিম নারী-শিশুদেরকে গণহারে হত্যা করা হচ্ছে। ফিলিস্তিন, ইরাক,

[৯৮] সহীহ বুখারী ২৬০৪।

আফগানিস্থান, কাশ্মীর, আরাকানসহ সর্বত্র একই চিত্র। মজলুম মুসলমানের আর্তনাদে গোটা পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে আছে। কুরআনের ভাষায় আমাদেরকে আহবান করা হয়েছে:

{وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء: ٧٥]

অর্থ: "আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে বের করে নিন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।"[৯৯]

হে মুসলিম যুবকেরা! তোমাদের কানে কি আল্লাহর এই আহবান পৌঁছে নি? সারা পৃথিবীর মজলুম মুসলমানদের চিৎকার কি তোমাদের রক্তে শিহরণ জাগাবে না? কে সাড়া দিবে আল্লাহর এই দ্বীপ্ত আহ্বানে? তোমরাই। তোমাদেরকেই আবার ময়দানে ঝাঁপিয়ে পরতে হবে। সালাহউদ্দীন আইয়ূবী, মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম, তারিক বিন যিয়াদ, খালিদ বিন ওয়ালিদ এর মতো।

যেনে রাখো! যে আল্লাহ সুব:, যেই কুরআনে, যেই রাসূলের উপর, যেই সূরায় (সূরায় বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ "তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে।" নাযিল করেছেন সেই আল্লাহ, সেই কুরআনেই, সেই রাসূলের উপর, সেই সূরাতেই (সূরায় বাকারার ২১৬ নং আয়াতে) বলেছেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ "তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে।"

অর্থচ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ "তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে।" মানতে তোমাদের কোনো আপত্তি নেই। তোমরা এটা পালন করার জন্য বাজারে জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছো। সিয়ামের মাধ্যমে শরীরের যতটুকু ঘাটতি হয়েছে, তা পূরণ করার জন্য খাবারের নতুন নতুন বিভিন্ন মেন্যু তৈরী করেছো। পেঁয়াজ আর ছোলার দাম বাড়িয়ে দিয়েছো। তারপরে সিয়াম শেষে ঈদুল ফিতর এর প্রস্তুতির জন্য নতুন নতুন জামা-

[৯৯] সুরা নিসা ৭৫।

কাপড়ের ফরমায়েশ দিয়ে রেখেছো। যুবতী মা-বোন ও মেয়েদেরকে অর্ধনগ্ন করে ঈদের কেনা-কাটার জন্য গোটা রমজান মাস মার্কেটে ছেড়ে দিয়েছো। প্রতিটি মসজিদে তারাবীহ এর জন্য সুমধুর কণ্ঠের হাফেজ সাহেবদেরকে নিয়োগ দিয়েছো। তাদেরকে মোটা অংকের পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য মসজিদ কমিটির কর্তা-ব্যক্তিরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মুসল্লিদের দারে দারে, মসজিদে, বাসায়, রাস্তা-ঘাটে, করজোড়ে ভিক্ষা করতে গিয়ে রাস্তার লেংরা-লূলা, আতুর-খোঁড়া, অন্ধ-বধির ভিখারীদেরকেও হার মানিয়েছো।

অথচ **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ** "তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে।" -শুনে তোমরা আঁতকে উঠো। যারা এই আয়াত গুলো তোমাদেরকে পাঠ করে শোনায় তোমরা তাদেরকে জঙ্গিবাদী বলো। যারা ফিলিস্তিনে, ইরাকে, আফগানিস্তানে, কাশ্মিরে, আরাকানে তাদের দীন রক্ষার জন্য, ভূমি রক্ষার জন্য, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্য, সর্বোপরি কুরআনের বিধান কায়েমের জন্য, তোমাদের নবীর দাঁতভাঙ্গা সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করছে, তোমরা তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করছো। তোমাদের মসজিদের কমিটির কর্তা-ব্যক্তিরা জিহাদের আয়াত শুনলে ক্ষেপে যান। খতীব সাহেবদেরকে জিহাদ ও কিতাল এর আলোচনা করতে বাঁধা প্রদান করেন। সেক্যুলার-পপুলার মুসল্লীগণ চেহারা মলিন করে ফেলেন।

এর কারণ কি? হ্যাঁ। কারণটা মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন। **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ** "তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে, **অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়**।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৬)

তবে জেনে রাখো! যারা كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ "তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে।" পালন করবে **কিন্তু** كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ "তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে।" মানবে না, তারা রোজাদার হতে পারে, মুসুল্লী হতে পারে, তাহাজ্জুদ গুজার হতে পারে, জাকেরীন-শাকেরীন হতে পারে, পীর-বুজুর্গ হতে পারে কিন্তু মুমিন হতে পারে না। তারা দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসিতা, আরাম-আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দে কাটালেও জান্নাতে যেতে পারবে না। কেননা মহান আল্লাহ সুবঃ বলেছেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿214﴾

অর্থ: "তোমরা ভেবেছো! যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের উপর আসেনি ঐ সকল বিপদাপদ, মুসীবত যা এসেছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কঠিন দুর্যোগ, ভয়াবহ ও সীমাহীন মসীবত এবং (শত্রুকর্তৃক) সৃষ্ট ভূমিকম্প (মারাত্মক আক্রমণ যা ভূমিকম্পের ন্যায় পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে তোলে)। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ এটা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।" (সূরা বাকারা আয়াত ২১৪)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আমাদের প্রতিও বিপদাপদ, মুসীবত ও শত্রুদের আক্রমণ হবে। সুতরাং ভয় পেয়ো না। বরং পবিত্র মাহে রমজানের বদর যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের চেতনা তৈরী করে এগিয়ে যাই হেরার আলোকজ্জ্বল রাজ পথের দিকে। মুক্ত করি আমাদের মজলুম মা-বোনদেরকে। কায়েম করি আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দীনকে। ধ্বংস করি মূর্তি ও মূর্তি সংরক্ষণকারীদেরকে। বিক্রয় করে দেই নিজের জান-মালকে আল্লাহর কাছে জান্নাতের বিনিময়ে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

كيف نستقبل رمضان
রমজানকে কিভাবে বরণ করবো?

এত মর্যাদা এবং ফজীলতের এই মাসকে আমরা কিভাবে স্বাগত জানাবো? কিভাবে বরণ করবো? খেলা-ধুলা, গল্প-গুজব, আড্ডাবাজি করেই কি আমরা রমজান অতিবাহিত করবো? না! বরং আল্লাহর নেক বান্দারা তথা সালাফে-সালেহীনগণ যেভাবে রমজানকে স্বাগত জানিয়েছেন, তারা যেভাবে রমজানকে বরণ করেছেন সেগুলো আমরা ভালো করে জানি এবং আমল করার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন: আমাদের সালাফগণ কিভাবে রমজানকে বরণ করতেন?
উত্তর: আমাদের সালাফগণ রমজান মাসে যে সকল ইবাদত করতেন তার কিছু অংশ নিম্নে পেশ করা হলো।

১. الصيام (সাওম আদায় করা)

রমযান মাসের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো **সাওম আদায় করা**। কোরআন-হাদীসে সাওমের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে বহু আলোচনা রয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: ১৮৩]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।" (সুরা বাকারা ১৮৩)

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة: ১৮৫]

অর্থ: "সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আলাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি

তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আলাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।" (সুরা বাকারা:১৮৫)
হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা:) রোজার বিশেষ ফজীলতের ঘোষণা দিয়েছেন। তন্মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْف قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

অর্থ: "আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী (সা:) বলেছেন: "মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "কিন্তু রোযা আমারই জন্য[১০০] এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করবো। বান্দাহ আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।" রোযাদারের জন্য দ'টি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি তার প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।"[১০১]
অপর আরেক হাদীসে রাসুল সা. ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (صحيح البخاري)

---

[১০০] 'রোযা আমারই জন্য': সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য তবে অন্যান্য ইবাদত যেমন, নামায, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি লোক দেখানোর জন্য কেউ কেউ করতে পারে। কিন্তু রোযার মধ্যে লোক দেখানোর প্রবৃত্তি থাকে না। কারণ গোপনে পানাহার করলে আল্লাহ ছাড়া কেউই জানতে পারে না। আর একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া কিছু তাকে বাধা দেয় না। তাই আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান দিবেন। আর দাতা যখন নিজ হাতে দান করেন বেশীই দান করেন।
[১০১] সহীহ বুখারী /৬৯৮৪ ; সহীহ মুসলিম /২৫৭৩ ; সুনানে নাসাঈ /২২১১ ; সুনানে তিরমিজি /৭৬১।

অর্থ: আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”[১০২]

টীকা ঃ মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মতে এক্ষেত্রে ঈমানের অর্থ হলো একথা বিশ্বাস করা যে রমযানের রাতে তারাবীহ পড়া হক ও সত্য। মহান আল্লাহর কাছে এর অনেক মর্যাদা। আর ইহতিসাবের অর্থ হলোঃ রমযান মাসের এই ইবাদত দ্বারা সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। মানুষকে দেখানো বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে এটা করবে না। অর্থাৎ ইসলাম বা মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার পরিপন্থী কোন উদ্দেশ্যে বা মনোবৃত্তি নিয়ে রমযানের রাতে নামায বা ইবাদত করবেনা- এটাই ইহতিসাব।

মুহাদ্দিসদের মতে, ‘কিয়ামুল্ লায়ল ফি রামাদান’ এর অর্থ তারাবীহর নামায। তবে তারাবীহর নামায একাকী বাড়ীতে পড়াই উত্তম না জামায়াতের সাথে মসজিদে পড়াই ইত্তম এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম ও আয়েম্মাগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ইবনে হাম্বল, শাফেয়ী ও তাঁর অধিকাংশ অনুসারী এবং ইমাম মালিক (র:) এর অনুসারী কোন কোন আলেমের মত হলোঃ মসজিদে জামায়াত করে পড়াই উত্তম যা হযরত ওমর ও সাহাবায়ে কিরাম (রা:) করেছিলেন। তবে ইমাম মালিক ও আবু ইউসুফ (র:) এবং ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী কোন কোন আলেমের মতে, একাকী বাড়ীতে পড়া যে কোন ব্যক্তির জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম নামায।

২. القيام (তারাবীহ-র সালাত)

রমযান মাসে দ্বিতীয় প্রধান ইবাদত হলো কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ-র সালাত)।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه مسلم)

[১০২] সহীহ বুখারী ৩৭; সহীহ মুসলিম ১৬৫৬।

অর্থ: “আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমজানে ইমান এবং ইহতিসাব এর সহিত রাত্রি জাগরণ করল তার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”[১০৩]

প্রশ্নঃ ‘ক্বিয়ামুল লাইলের’ (তারাবীহ) এর বিধান কি?

উত্তর: রমজানের ‘ক্বিয়ামুল লাইল’ (তারবীহ) একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَ أَبِيكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ (سنن النسائي)

অর্থ: “নজর ইবনে শাইবান বলেন আমি আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমানকে বললাম, আমাকে তুমি রমজান মাস সম্পর্কে এমন একটি হাদীস শুনাও যা তুমি তোমার পিতার নিকট থেকে শুনেছ এবং তোমার পিতা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর থেকে শুনেছেন, যেন তোমার পিতা এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মাঝখানে কোন ভায়া মাধ্যম না থাকে। তিনি বললেন হ্যা! আমার পিতা আমাকে বলেছেন যে, রাসূলূল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:) রমজানের সিয়ামকে ফরজ করেছেন আর আমি তোমাদের জন্য রমজানের কিয়ামকে (তারাবীহকে) সুন্নত করেছি।”[১০৪]

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, তারাবীহের সালাত রাসূল (সা:) কতৃক ঘোষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আল্লাহর রাসূল (সা:) নিজেও কয়েক রাতে তারাবীহের সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু তারপরে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশংকায় আর পড়েন নাই। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে:

[১০৩] সহীহ মুসলিম ১৮১৬

[১০৪] সুনানে নাসায়ী ২২০৯।

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال (أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) . فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك

অর্থ: “আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) গভীর রাতে বের হয়ে মসজিদে সালাত আদায় করেন, কিছু সংখ্যক পুরুষ তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেন। সকালে লোকেরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেন ফলে লোকেরা অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। তিনি সালাত আদায় করেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। সকালে তাঁরা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তৃতীয় রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। এবপর রাসূলুল্লাহ (সা;) বের হয়ে সালাত আদায় করেন ও লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন।

চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংকুলান হল না, কিন্তু তিনি রাতে আর বের না হয়ে ফজরের সালাতে বেরিয়ে আসলেন এবং সালাত শেষে লোকদের দিকে ফিরে প্রথমে তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দেওয়ার পর বললেন, শোন! তোমাদের (গতরাতের) অবস্থান আমার অজানা ছিল না, কিন্তু আমি এই সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবার আশংকা করছি (বিধায় বের হই নাই)। কেননা তোমরা তা আদায় করায় অপারগ হয়ে পড়তে। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ওফাত হলো আর ব্যাপারটি এভাবেই থেকে যায়।” [১০৫]

তারপরে সাহাবাগণ বিচ্ছিন্নভাবে তারাবীহ আদায় করতেন। পরবর্তীতে ওমর (রা:) পরবর্তীতে মনে করলেন যে, এখন তো আর ফরজ হওয়ার আর কোন সম্ভবনা নেই। তাই তিনি একজন ইমামের পিছনে তারাবীহের

[১০৫] সহীহ বুখারী ১৮৮৫।

সালাত আদায় করার ব্যবস্থা করেন। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের হাদীসটিতে রয়েছে।

عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري)

অর্থ: আবদুর রাহমান ইবনে আবদ আল–ক্বারী (র:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রমজানের এক রাতে ‘ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিক্ষিপ্ত জামায়াতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং তার ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। ‘ওমর (রা:) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি উবাই ইবনে কা’ব (রা:) এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর (ওমর (রা:) সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। ওমর (রা:) বললেন, কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা ! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করতো।[১০৬]

এখানে বুঝা গেল তারাবীহের সালাত নিয়মিতভাবে জামাআ'তের সাথে বর্তমানে যে চালু আছে এটা ওমর (রা:) থেকে শুরু হয়েছে। এই হাদীসে “কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা !” এ কথা দ্বারা বেদআ’তীগণ

[১০৬] সহীহ বুখারী ১৮৮৩।

বেদআ'তে হাসানার স্বপক্ষে দলীল পেশ করে থাকে। অথচ এটা শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থে বিদআ'ত বা নতুন ব্যবস্থা বলা হয়েছে। নতুবা ইসলামের পরিভাষায় বেদআ'ত বলা হয় الاحداث في الدين ما لا اصل لهٗ দ্বীনে ইসলামের ভিতরে ইবাদতের আকারে সওয়াবের উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীনভাবে নতুন করে কোন কিছু তৈরি করা। সে অনুযায়ী তারাবীহের সালাতকে কোনভাবেই বিদআ'ত বলা যায় না। কেননা তারাবীহের সালাত আল্লাহ রাসূল (সা:) নিজে আদায় করেছেন এবং জামাআ'তের সাথেই আদায় করেছেন। যা বুখারী, মুসলিম সহ হাদীসের সকল কিতাবেই উল্লেখ রয়েছে। তারপরে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) যে নতুন করে নিয়মিত জামাতের ব্যবস্থা করলেন তাকেও বিদআ'ত বলা যায় না। কেননা তিনি একজন 'খোলাফায়ে রাশেদার' একজন অন্যতম খলিফা। আর রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন :

عن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (سنن أبي داود للسجستاني)

অর্থ: "ইরবাত ইবনে সারিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন তোমরা আমার সুন্নাহ এবং সঠিক পথের দিশাপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে অনুসরণ কর। এবং উহা শক্তভাবে ধারণ কর এবং মাড়ির দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধর। আর খবরদার! তোমরা নবআবিষ্কৃত কাজ থেকে বেঁচে থাক। কেননা (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) নতুন করে তৈরি করা সকল কাজই বিদ'আহ। আর সকল বিদআ'ত ই গোমরাহী , ভ্রষ্ঠতা।[১০৭]

সুতরাং ওমর (রা:) যে কাজটি করেছেন সেটিকে কোন অবস্থাই ইসলামের পরিভাষায় বিদআ'ত বলা যায় না। ওমর (রা:) নিজে যেটা বলেছেন তা শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থে বলেছেন। কাজেই এটাকে ভিত্তি করে বিদআ'তকে হাসানা ও সায়্যিআহ তে ভাগ করে ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিদআ'ত তৈরি করা। মূলত: রাসূল (সা:) এর রেখে যাওয়া ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই না।

প্রশ্ন: 'ক্বিয়ামুল লাইল' (তারাবীহ) কত রাকআ'ত?

[১০৭] সুনানে আবু দউদ ৪৬০৯।

উত্তর: তারাবীর সালাতের রাকাআত নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন বিশ রাকাআ'ত আবার কেউ বলেছেন আট রাকাআ'ত। আরো অনেক মতামত রয়েছে। তবে বর্তমানে শুধু ২০ রাকাআত ও ৮ রাকাআতের আমলই চালু আছে।

প্রশ্ন: যারা বিশ রাকাআতের প্রবক্তা তাদের দলীল কি?

উত্তর: যারা ২০ রাকাআতের প্রবক্তা তাদের দলীলগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো:

أَبُو الْخَصِيبِ قَالَ : كَانَ يَؤُمُّنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً. (السنن الكبرى للبيهقي)

অর্থ; "আবুল খাসিব (রা:) বলেন, সুওয়াইদ বিন গাফালাহ রমজান মাসে পাঁচ বৈঠকে বিশ রাকাআত তারাবীহ সালাত পরিয়েছেন"।[১০৮]

এছাড়াও তারা আরো দলীল পেশ করেছেন।

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً. قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ. (السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي)

অর্থ: "আবু আবদুর রহামান আস সুলামী (র:) আলি (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রমজান মাসে কুররাদেরকে (হাফেজদেকে) ডাকলেন। এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে আদেশ দিলেন সে যেন লোকদেরকে নিয়ে ২০ রাকাআত সালাত আদায় করে। (বর্ণনাকারী বলেন) আলি (রা:) তাদের বেতেরের ইমামতি করতেন"।[১০৯]

অপর হাদীসে উল্লেখ আছে।

عن حسن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث (المصنف–ابن أبي شيبة (১৫/ ৪২৯)

অর্থ: "হাসান আব্দুল আযীয বিন রাফি (র:) বলেন, উবাই ইবনে (রা:) মদিনাতে রমজান মাসে লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত সালাত পড়তেন। এবং বেতের পড়তেন তিন রাকাআত।"[১১০]

[১০৮] সুনানে বাইহাকী ৪৮০৩।
[১০৯] সুনানে বাইহাকী ৪৮০৪।
[১১০] মুসান্নফে ইবনে আবী শাইবা

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ আছে:

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر (المصنف–ابن أبي شيبة (১৫/ ৪৩০)

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা;) রমাজনে বিশ রাকাআ'ত সালাত পড়তেন এবং বিতির এর সালাতও পড়তেন।[১১১]

অপর হাদীসে উল্লেখ আছে:

عن نافع عن عمر قال كان ابن أبي مليكة يـــصلي بنـــا في رمـــضان عـــشرين ركعة(المصنف لإبن أبي شيبه (৩/ ২৫৫)

অর্থ: "নাফে' ওমর (রা:) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন ইবনে আবী মূলাইকা আমাদেরকে নিয়ে রমজানে বিশ রাকাআ'ত সালাত আদায় করতেন।"[১১২]

এই হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ মুসলমানরা বর্তমানে ২০ রাকাআ'ত তারাবীহ পড়ছে। এবং মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীর আমল এটাই।

প্রশ্ন: যারা ৮ রাকাআত সালাতুত তারাবীর প্রবক্তা তাদের দলীল কি?

উত্তর: যারা ৮ রাকাআত সালাতুত তারাবীর প্রবক্তা তারা নিম্নে হাদীসগুলো দিয়ে দলীল পেশ করে :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّـــهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (صحيح البخـــاري ـــ م م (৩/ ৪৫)

[১১১] মুসন্নাফে ইবনে আবী শাইবা:২৮৬।

[১১২] মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবা ২২৭।

অর্থ: "আবু সালামা বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, "তিনি 'আয়শা (রা:) কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমজানে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সালাত কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, রমজানে মাসে ও রমজান ছাড়া অন্য সময়ে (রাতে) তিনি এগারো রাকাআ'ত হতে বৃদ্ধি করতেন না। তিনি চার রাকাআত সালাত আদায় করতেন, সে চার রাকাআ'তের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর চার রাকাআত সালাত আদায় করতেন , তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর তিন রাকাআত সালাত আদায় করতেন। আমি (আয়শা রা:) বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:) আপনি বিতর আদায়ের আগে ঘুমিয়ে যাবেন? তিনি বললেন, হে 'আয়শা! আমার দু'চোখ ঘুমায় বটে কিন্তু আমার কালব নিদ্রাভিভূত হয় না।"[১১৩]

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) রমজান ও রমজান ছাড়া অন্য কোন সময়ে রাতে এগার রাকাআতের বেশী সালাত আদায় করেন নাই। আট রাকাআত ছিল তারাবী বাকি তিন রাকাআত বেতের। যেহেতু হাদীসটি সহীহ এবং হাদীসের গ্রহণযোগ্য সকল কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে। তাই তারা এটির উপরেই আমল করে থাকেন। মক্কা মদিনায় হারামাইন শরিফাইন ছাড়া অন্য মসজিদ গুলোতে আট রাকাআ'তই 'সালাতুত তারাবী' আদায় করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: যারা আট রাকাআতের প্রবক্তা তারা বিশ রাকাআতের হাদীসগুলো সম্পর্কে কি বলেন?

উত্তর: তারা বিশ রাকাআতের হাদীসগুলো সম্পর্কে বলেন যে, ঐ গুলো কোন সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। যদিও হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি। হাজার কলাগাছ একত্র করলেও একটি তালগাছ হবে না। আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ ও সরীহ' (সনদের বিবেচনায় বিশুদ্ধ ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে স্পষ্ট)। তাই ঐ ডজন খানিক হাদীস মিলেও আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের মোকাবেলা করতে পারবে না। একারণেই তারা আট রাকাআতের হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। আর বিশ রাকাআতপন্থিদের হাদীসগুলো সম্পর্কে বলেন যে এগুলো কোন সহীহ সনদ দ্বারা প্রমানিত নয়। যেমন: ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ:) তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'তামামূল মিন্নাহ' নামক কিতাবে বলেন:

[১১৩] সহীহ বুখারী ১৮৮৬ ; মুসলিম ১৫৭৫।

. قلت : أما عن عثمان فلا أعلم أحدا روى ذلك عنه ، ولو بسند ضعيف . وأما عمر وعلي ، فقد روي ذلك عنهما بأسانيد كلها معلولة (تمام المنة لمحمد الألباني)

অর্থ: "ওসমান (রা:) এর থেকে বিশ রাকাআত তারাবী সম্পর্কে কোন দূর্বল সনদেও কোন হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আর ওমর ও আলি (রা:) থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তার সবগুলোই দূর্বল।"[১১৪]

৩. الصدقة (দান-খয়রাত করা)

রমজান মাসের আরেকটি ইবাদত হলো 'ছাদাকাহ করা' (অর্থাৎ ফিতরা এবং অন্যান্য নফল ছাদাকাহ প্রদান করা)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (رواه البخاري)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ (সা:) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রমজানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল (আ:) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। আর রমজানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আ:) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সা:) (বসন্ত মৌসুমে প্রবাহিত প্রথম বাতাস) রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।"[১১৫]

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দানশীলতাকে এমন একটি উপমা দিলেন যা পৃথিবীতে বিরল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দানশীলতাকে বসন্ত মৌসুমের প্রথমে যে বাতাস প্রবাহিত হয় তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার কারণ হচ্ছে ঐ বাতাসের মধ্যে তিনটি গুন থাকে। এক: ঐ বাতাসের মাধ্যমে গাছ-পালা, তরু-লতা, পশু-পক্ষী সহ সকল সৃষ্টিই ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়। দুই: ঐ

[১১৪] তামামুন্ন মিন্নাহ ২য় খন্ড ২৬৫ পৃষ্ঠা।

[১১৫] সহীহ বূখারী ৫; সহীহ মুসলিম ৫৮৩৮।

বাতাসের প্রভাবে গাছ-পালা, তরু-লতা সহ সকল কিছুতে খুব দ্রুত পরিবর্তন ও সজিবতা ফিরে আসে। তিন: যেসব গাছ-গাছালি, তরু-লতা ইত্যাদি মৃত্যুর দারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল তারা আবার নতুন জীবন লাভ করে।

এই হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা:) আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) কে এই বাতাসের সঙ্গে তুলনা করে জানিয়ে দিলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দান এত ব্যাপক ছিল যে, তার মাধ্যমে মানব-দানব, পশু-পক্ষি, গাছ-পালা, তরু-লতাসহ সকলেই ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মাধ্যমে খুব দ্রুত জাহেলী সমাজের সকল বর্বরতা দুরিভূত হয়ে 'খায়রুল কুরুণ' বা সর্বোত্তম যুগ বলে ইতিহাস সৃষ্টি হলো। তৃতীয়ত: যে সকল মানুষ নিজেরাই দিশেহারা হয়ে ধংসের দারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সংস্পর্শে এসে তারা শুধু হেদায়াত প্রাপ্ত বা সত্যপথের দিশাই পান নাই বরং তারা একেক জন দিশারী বনে গিয়েছিলেন।

درفشاني نے تيري قطروں كو دريا كر ديا+دل كو روشن كرديا آنكهوں كو بينا كر ديا

خود نه تهے جو راه پر اوروں كے هادي بن گئے+ كيا نظر تهي جس ني مردوں كو مسيحه كر ديا

যাই হোক রমজান মাসে দানের সওয়াব অনেক বেশী বলেই রাসূলুল্লাহ (সা:) রমজান মাসে বেশী বেশী দান করতেন। আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَن أَنَس أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الصدقة صدقة في رمضان (كما في مسند البزار)

অর্থ: "আনাস (রা:) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, সর্বোত্তম সাদাকাহ (দান) হচ্ছে রমজান মাসের সাদাকাহ।"[১১৬]

৪. افطار الصائم (সিয়ামপালনকারীদের ইফতার করানো)

রমজান মাসে আরেকটি ফজিলতপূর্ণ ইবাদত হলো সিয়াম পালনকারীদের কে ইফতার করানো। হাদীসে এরশাদ হয়েছে:

[১১৬] মুসনাদে বাজ্জার ৬৮৮৯ নং হাদীস হাদীসটি গরীব।

عَنْ زَيْد بْنِ خَالد الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا (رواه الترمذي) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح

অর্থ: "জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সায়েমকে ইফতার করালো সে ব্যক্তি উক্ত সায়েমের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। এতে সায়েমের সওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না।"[১১৭]

৫. الاجتهاد في تلاوة القران (বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা)

রমজানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা। কেননা এমাসেই কুরআনুল কারিম নাজিল করা হয়েছে। মূলত: কুরআন নাজিলের কারণেই এ মাসের এত বড় মর্যাদা। নতুবা পৃথিবীর ইতিহাসে কত রমজান এলো আর গেল কেউ তার খবরও রাখে নাই কিন্তু কুরআন নাজিলের পর থেকে এ মাসের মর্যাদা বেড়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [البقرة/১৮৫]

অর্থ: "রমজান মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে।"[১১৮]

অবশ্য কিছু কিছু হাদীস দ্বারা জানা যায় যে অন্যান্য আসমানী কিতাবও রমজান মাসে নাজিল করা হয়েছিল। তাফসীরে ইবনে কাসিরে এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।

عن واثلة –يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صُحُف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لستٍّ مَضَين من رمضان والإنجيل لثلاث عَشْرَةَ خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور أنزل لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان (تفسير ابن كثير)

[১১৭] সুনানে তিরমিজি ৮০৪ নং হাদীস; হাদীসটি হাসান সহীহ; হাদীসটি বাইহাকিতেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে (হাদীস নং ৮৩৯৫)।

[১১৮] সুরা বাকারা ১৮৫।

অর্থ: "ওয়াসিলা ইবনে আসকা'আ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেছেনঃ ইবরাহিম (আ:) এর সহিফাসমূহ রমজানের প্রথম রাতে, মূসা (আ:) এর তাওরাত রমজানের ষষ্ঠ তারিখে, ঈসা (আ:) এর ইঞ্জিল রমজানের তের তারিখে এবং কুরআনুল কারীম রমজানের চব্বিশ তারিখে নাজিল হয়েছে। জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীসে আরো বলা হয়েছে দাউদ (আ:) এর যাবুর নাজিল হয়েছিল বারই রমজানের রাতে।"[১১৯]

রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও রমজান মাসে বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (رواه البخاري)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ (সা:) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রমজানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল (আ:) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। **আর রমজানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আ:) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন**। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সা:) (বসন্ত মৌসুমে প্রবাহিত প্রথম বাতাস) রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।[১২০]

৬. الاعتكاف (ই'তিকাফ করা)

রমজান মাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে 'ইতিকাফ' করা।

প্রশ্ন: ই'তিকাফ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: الاعتكاف (ইতিকাফ) শব্দটি عكف (আ'কফুন) শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ কোন কাজের সাথে নিজেকে আটকে রাখা, রত রাখা, লিপ্ত রাখা চাই ভাল কাজে হোক কিংবা মন্দ কাজে। যেমন মূর্তিপূজকদের ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

[১১৯] তাফসিরে ইবনে কাসির ১ম খন্ড ৫০১ নং পৃষ্ঠা।

[১২০] সহীহ বুখারী ৫; সহীহ মুসলিম ৫৮৩৮।

}إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ{ [الأنبياء: ৫২]

অর্থ: যখন সে (ইবরাহীম (আ:) তার পিতা ও তার কওমকে বলল, 'এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর পূজায় তোমরা **রত** রয়েছ'?[১২১]

প্রশ্ন: ইসলামের পরিভাষায় ই'তিকাফ কাকে বলে?

উত্তর: ইসলামের পরিভাষায় ইতিকাফ বলা হয়:

وهو لزوم المسجد و الاقامة فيه بنية التقرب الي الله عز و جل

'আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আশায় মসজিদে অবস্থান করা।'

ই'তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ ব্যাপারে সমস্ত ওলামাদের ইজমা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর সাহাবীগণ এবং স্ত্রীগণও তাঁর সাথে এবং পরবর্তীতে ই'তিকাফ করেছেন। এ সর্ম্পকে কিছু হাদীস পেশ করা হলো:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا(صحيح البخاري)

অর্থ: "আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) প্রতি রমজানে দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর বিশদিন ই'তিকাফ করেছেন।"[১২২]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ (صحيح البخاري ـــ م م)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) রমজান মাসের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন।"[১২৩]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

[১২১] সুরা আম্বিয়া ৫২ নং আয়াত;
[১২২] সহীহ বুখারী / ২০৪৪।
[১২৩] সহীহ বুখারী / ২০২৫।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِى قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ قَالَ فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِى نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ إِنِّى اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِى إِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ « وَإِنِّى أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ وَأَنِّى أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِى طِينٍ وَمَاءٍ (صحيح مسلم للنيسابوري)

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা:) রমজানের প্রথম দশদিন ই'তেকাফ করলেন। অতঃপর তিনি মধ্যের দশকে একটি তুর্কী তাঁবুর ভিতরে ই'তেকাফ করলেন। এর দরজায় খেজুর পাতার তৈরী একটি মাদুর ঝুলানো ছিলো। তিনি নিজ হাতে মাদুরটি খুলে তাঁবুর এক পাশে রেখে দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁবুর ভিতর থেকে মাথা বের করে লোকদের সাথে আলাপ করলেন।

তারা তাঁর নিকটে এগিয়ে আসলে তিনি বললেন, আমি এ রাতের খোঁজ করতে গিয়ে প্রথম দশদিন ই'তেকাফ করেছি। অতঃপর মাঝের দশকেও ই'তেকাফ করেছি। অবশেষে আমার কাছে এক ফেরেশতা এসে বলেছে যে, তা শেষ দশকে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা ই'তেকাফ করতে চায় তারা যেন (শেষ দশকে) ই'তেকাফ করে। **অতঃপর লোকেরা তাঁর সাথে ই'তেকাফ করলো**। তিনি আরো বলেছেন, আমাকে তা বেজোড় রাতের মধ্যে দেখানো হয়েছে। আমি ঐ রাতের শেষে (প্রভাতে) কাদা ও পানির মধ্যে নিজেকে সিজদা করতে দেখেছি।"[১২৪]

প্রশ্ন: ই'তিকাফের রোকন কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ই'তিকাফের রোকন দুইটি।

১. المكث في المسجد। (মসজিদে অবস্থান করা)

[১২৪] সহীহ মুসলিম/২৬৩৭।

ই'তিকাফ করার জন্য মসজিদ শর্ত। মসজিদ বিহীন কোন ঘরে বা খানকায় মেয়েলোক বা পুরুষ কারো জন্য ই'তিকাফ করা জায়েজ নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

[وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ] [البقرة: ১৮৭]

অর্থ: "আর তোমরা **মাসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায়** স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।"[১২৫] এই আয়াতে মসজিদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মসজিদ ছাড়া যদি ই'তিকাফ জায়েজ হতো তাহলে শুধু وانــتم عــاكفون (ই'তিকাফরত অবস্থায়) বলা হতো। মসজিদের কথা উল্লেখ করা হতো না। কেননা ই'তিকাফকালীন সর্ববস্থায় স্ত্রী সহবাস করা নিষেধ। অবশ্য মেয়েলোকদের জন্য যদি মসজিদে ই'তিকাফ করার সুব্যবস্থা না থাকে তাহলে তারা ঘরে বসে নির্জনে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করতে পারবে। ই'তিকাফ নয়। কারণ মহিলাদের ঘরে ই'তিকাফ করার ব্যাপারে সহীহ কোন দলীল পাওয়া যায় না।

২. نية التقرب الي الله تعالي (আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়্যাত করা)

ই'তিকাফের দ্বিতীয় রোকন হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করা। কেননা আল্লাহ (সুব:) এরশাদ করেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة/৫]

অর্থ: "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে খালিস করে।"[১২৬]

হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَــا الأَعْمَــالُ بِالنِّيَّةِ (رواه البخاري و مسلم)

অর্থ: "ওমর ইবনে খাত্তার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।"[১২৭]

প্রশ্ন: ই'তিকাফের শর্ত কি কি?

[১২৫] সুরা বাকারা ১৮৭।
[১২৬] সুরা বাইয়িনা ৫ নং আয়াত।
[১২৭] সহীহ মুসলিম ৫০৩৬; সহীহ বুখারী ১ নং হাদীস।

উত্তর: ই'তিকাফের জন্য শর্ত হলো যে, মু'তাকিফ (ই'তিকাফকারী) কে ১. মুসলিম হতে হবে। ২. বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। ৩. হায়েজ, নিফাস ও জানাবাত (যার উপর গোসল ফরজ) থেকে পাক-পবিত্র হতে হবে। সুতরাং কোন কাফের, শিশু, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পাগল এবং হায়েজ-নেফাস অবস্থায় মেয়েলোক ও জানাবাতের নাপাক অবস্থায় কোন পুরুষ-মহিলা ই'তিকাফ করতে পারবে না।

প্রশ্ন: ই'তিকাফ অবস্থায় কোন্ কোন্ কাজ করা যাবে?

উত্তর: ই'তিকাফ অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজ গুলো করা যাবে।

ক. ই'তিকাফ অবস্থায় মাথার চুল কাটা বা মুন্ডানো, চুল আঁচড়ানো, নখ কাটা, শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ভাল কাপড়-চোপড় পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি জায়েজ।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكُــونُ مُعْتَكِفًــا فِــي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ (البخاري و مسلم و سنن أبي داود للسجستاني)

অর্থ: "আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় আমার কাছে হুজরার ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে দিতেন আমি তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম। অপর রেওয়ায়েতে 'আমি হায়েজ অবস্থায় তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম।"[১২৮]

খ. যে সকল কাজ মসজিদে সম্পন্ন করা যায় না তা সমাধানের জন্য বের হওয়া যাবে। যেমন: পেশাব, পায়খানা করার জন্য, বমি করার জন্য, যার খানা-পিনা পৌছানোর ব্যবস্থা নাই তার খানা-পিনা করার জন্য বের হওয়া ইত্যাদি। এমনিভাবে জানাবাতের ফরজ গোসল করার জন্য, শরীরের বা কাপড়-চোপড়ের নাপাক দূর করার জন্য বের হওয়া যাবে তবে দীর্ঘ সময় কাটানো যাবে না। এমনিভাবে জু'মুআর সালাতের জন্য ও জানাযার সালাতের জন্যও বের হওয়া যাবে।[১২৯]

[১২৮] সহীহ বুখারী , মুসলিম, আবু দাউদ,
[১২৯] ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৫৪।

গ. ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে খানা-পিনা করা ও ঘুমানো জায়েজ। প্রয়োজনে আকদে নিকাহ ও বেচা-কেনা করাও জায়েজ।[১৩০]

প্রশ্ন: কি কাজ করলে ই'তিকাফ বাতিল হয়?

উত্তর: নিম্নোক্ত কাজ করলে ই'তিকাফ বাতিল হয়:

ক. বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদ থেকে বের হওয়া, যদিও তা অল্প সময়ের জন্য হয়। কেননা এর দ্বারা ই'তিকাফের একটি রোকন নষ্ট হয়ে যায়। আর তা হলো **المكث في المسجد** বা মসজিদে অবস্থান করা।

খ. মুরতাদ হয়ে যাওয়া। কেননা রিদ্দাত বা মুরতাদ হওয়ার মাধ্যমে মানুষের সকল আমলই নষ্ট হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেনঃ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الزمر: ৬৫

অর্থ: "তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৩১]

গ. পাগল বা মাতাল হয়ে যাওয়া।

ঘ. মহিলাদের হায়েজ বা নেফাস শুরু হওয়া।

ঙ. স্ত্রী সহবাস করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: ১৮৭

অর্থ: "আর তোমরা **মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায়** স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।"[১৩২]

৭. العمرة في رمضان রমজানে ওমরাহ্ করা

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنْ الْحَجِّ قَالَتْ أَبُو فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي (صحيح البخاري)

[১৩০] ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৫৪।

[১৩১] সুরা যুমার ৬৫।

[১৩২] সুরা বাকারা ১৮৭।

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন হজ্জ থেকে ফিরে (মদিনায়) এলেন তখন উম্মে সিনান আল আনসারী (রা:) (মহিলা) কে বললেন, তোমাকে হজ্জ করতে যেতে বাধা দিল কে? মহিলা উত্তর দিলঃ তার স্বামী তাকে বাঁধা দিয়েছে। তার দুটি উট রয়েছে; একটিতে সে হজ্জ করেছে অপরটি আমাদের জমিনে পানি সেঁচ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন রমজান মাসের 'ওমরাহ' আমার সাথে হজ্জ করার সমতুল্য।"[১৩৩]

৮. تحري ليلة القدر 'লাইলাতুল কদর' অনুসন্ধান করা

প্রশ্ন: লাইলাতুল কদর কোন রাত?

উত্তর: লাইলাতুল কদর এর ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে নির্ধারিত কোন রাতকে লাইলাতুল কদর হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কারণ কোন কোন হাদীসে রমজানের শেষ দশকের প্রতি রাতেই লাইলাতুল কদর তালাশ করতে বলা হয়েছে। আবার কোন কোন হাদীসে শেষ দশকের শুধুমাত্র বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ করতে বলা হয়েছে। আবার কোন কোন হাদীসে ২১ এবং ২৭ তারিখকে লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনাকে অন্যান্য রাতের তুলনায় একটু বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিম্নে হাদীসগুলো থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

ক. রমজানের শেষ দশকের যে কোন রাত লাইলাতুল কদর

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (صحيح البخاري)

অর্থ: আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন এবং বলতেন তোমরা রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর।[১৩৪]

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহর রাসূল (সা:) রমাজানের শেষ দশকে বেশী বেশী ইবাদত করতেন। হাদীস:

[১৩৩] সহীহ বুখারী/১৮৬৩; সুনানে আবু দাউদ/১৯৯০;

[১৩৪] সহীহ বুখারী ১৮৯২।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَه (صحيح البخاري)

অর্থ: "আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রমজানের শেষ দশক আসত তখন নবী করীম (সা:) তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশী বেশী ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্রে জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।"[১৩৫]

খ. রমজানের শেষ দশকের যে কোন বে-জোড় রাত লাইলাতুল কদর

জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতামত হলো লাইলাতুল কদর রমাজানের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাতে । এটাই সর্বাধিক সঠিক মতামত। কারণ অনেকগুলো সহীহ হাদীসে রমাজানের শেষ দশকের বেজোর রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করতে বলা হয়েছে। হাদীস:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (صحيح البخاري)

অর্থ: হযরত আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমরা রমজান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করো।"[১৩৬]

গ. রমজানের ২১ তারিখের রাত

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أُرِيتُ هَذِه اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَاسْتَهَلَّتْ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَة فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصُرَتْ عَيْنِي نَظَرْتُ إِلَيْه (صحيح البخاري

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল্লাহ (সা:) বললেন: শেষ দাশকে ঐ রাতের তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা তালাশ কর। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ঐ রাতে আমি

[১৩৫] সহীহ বুখারী ১৮৯৭।
[১৩৬] সহীহ বুখারী ২০১৭।

কাদা-পানিতে সিজদা করছি। এ রাতে আকাশে প্রচুর মেঘের সঞ্চার হয় এবং বৃষ্টি হয়। মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সালাতের স্থানেও বৃষ্টির পানি পড়তে থাকে। এটা ছিল **একুশ তারিখের রাত**। যখন তিনি ফজরের সালাত শেষে ফিরে বসেন তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, তাঁর মুখমন্ডল কাদা-পানি মাখা।[১৩৭]

ঘ. রমাজানের ২৭ তারিখের রাত।

অন্যান্য বেজোড় রাতের তুলনায় ২৭ তারিখের রাতে হওয়ার সম্ভবনা একটু বেশী। কারণ হাদীসে এরশাদ হয়েছে:

سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْب – رضى الله عنه – فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُود يَقُولُ مَنْ يَقُم الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِى رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلاَمَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِى أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذ لاَ شُعَاعَ لَهَا.(صحيح مسلم للنيسابوري)

অর্থ: যির ইবনে হুবায়েশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি উবাই ইবনে কা'বকে রা: জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছর প্রতি রাতে জাগতে পারবে কেবল সেই লাইলাতুল কদর পাবে। অতপর উবাই (রা:) বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন! এ কথা দ্বারা তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মানুষ যেন এর উপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত না থাকে। অন্যথায় তিনি অবশ্যই জানেন যে, তা রমজান মাসে। রমজানের শেষের দশ রাতে অথাৎ সাতাশের রাতে। **এরপর তিনি ইনশাআল্লাহ বলা ছাড়াই হলফ করলেন এবং বললেন যে নিশ্চয়ই তা ২৭ তারিখের রাতে**। তখন আমি (যির) বললাম, হে আবু মুনজির! আপনি একথা কোন সূত্রে বলছেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূল (সা:) আমাদেরকে যে আলামত বা নিদর্শন বলেছেন সেইসূত্রে। আর তা

[১৩৭] সহীহ বুখারী ১৮৯১।

হলো- যে রাতে কদর অনুষ্ঠিত হয় তারপর সকালে সে সূর্য ওঠে তার কিরণ থাকে না।[১৩৮]

৯.১০. الدعاء والذكر বেশি বেশি দু'আ ও যিকির করা:

প্রশ্ন: সকাল সন্ধ্যায় আমরা কোন কোন দু'আ পাঠ করতে পারি?

উত্তর: সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করার জন্য হাদীস থেকে কিছু দু'আ পাঠ করার সময় এবং ফায়েদাসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

দৈনিক পঠিতব্য দু'আ ও যিকির	সময় ও সংখ্যা	সাওয়াব ও ফজীলত
আয়াতুল কুরসী اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَـيُّ الْقَيُّـوم..... ....[১৩৯] (সুরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত।)	সকালে, সন্ধ্যায়,নিদ্রার পূর্বে ও প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (একবার)।	শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না, জান্নাতে প্রবেশ করার অন্যতম কারণ।[১৪০]
সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ..........।[১৪১]	নিদ্রার পূর্বে।	সকল বস্তর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালাই

[১৩৮]১৩৮ সহীহ মুললিম ২৬৪৩।

[১৩৯] {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [البقرة: ২৫৫]

[১৪০] সহীহ বুখারী ২১৮৭। সুনানে নাসায়ী কুবরা ১০৭৯৭।

[১৪১] { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (২৮৫) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } [البقرة: ২৮৫، ২৮৬]

		যথেষ্ট হয়ে যাবেন।[১৪২]
সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস।	সকালে তিনবার, বিকালে তিনবার।	সকল অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট।
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তুই কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী।	সকালে তিনবার, সন্ধ্যায় তিনবার।	হঠাৎ কোন বিপদে পড়বে না এবং কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।[১৪৩]
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نبيًّا و رَسُولاً "আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহকে রব, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা এবং মুহাম্মদ (সা:) কে নবী ও রাসূল হিসেবে।	সকালে তিনবার, সন্ধ্যায় তিনবার।	যে ব্যক্তি এর মমার্থ বুঝে পাঠ করবে আল্লাহর উপর অবশ্যক হয়ে যায় যে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১৪৪]
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ	সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার সকালে একবার, সন্ধ্যায়	যে ব্যক্তি সকালে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে উহা পাঠ করবে, যদি দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়,

[১৪২] সহীহ বুখারী ৪০০৮।

[১৪৩] সুনানে তিরমিজি ৩৩৮৮; সুনানে আবু দাউদ ৫০৯০।

[১৪৪] মুসনাদে আহমদ ১৮৯৮৮।

لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ “হে আল্লাহ তুমি আমার প্রভু প্রতিপালক, তুমি ছাড়া ইবাদত যোগ্য কোন ইলাহ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গিকার রক্ষা করছি। আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়া'মত স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে আমার পাপকর্মের স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর, কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশী কেহই ক্ষমা করতে পারে না।	একবার।	তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদি রাতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে উহা পাঠ করে এবং রাতের মধ্যে মৃত্যু হয়, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৪৫]
سنن أبي داود للسجستاني (8/ 484) اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِى إِلَى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِى شَأْنِى كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ	সকালে, বিকালে একবার পাঠ করবে।	বিপদ আপদের দু'আ। সুনানে নাসায়ীতে উল্লেখ আছে যে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা:) ফাতেমা (রা:) এই দো'য়া পড়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।[১৪৬]
اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى بَدَنِى اللَّهُمَّ عَافِنِى	সকালে	রাসূলুল্লাহ (সা:)

[১৪৫] সহীহ বুখারী ৬৩০৬।
[১৪৬] সুনানে নাসায়ী কুবারা ১০৪০৫; মুসনাদে আহমদ ২০৪৩০।

فِى سَمْعِى اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى بَصَرِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ “হে আল্লাহ ! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান কর, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে নিরাপদ রাখ। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী ও দারিদ্র থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি ক্ববরের আযাব থেকে । তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই।	তিনবার, সন্ধ্যায় তিনবার।	এই দো'য়া পাঠ করতেন।[১৪৭]
سُبْحَانَ اللَّه عَدَدَ خَلْقه سُبْحَانَ اللَّه رِضَا نَفْسه سُبْحَانَ اللَّه زِنَةَ عَرْشه سُبْحَانَ اللَّه مِدَادَ كَلِمَاته	সকালে ফজরের সালাতের তিন বার পাঠ করবে।	ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অন্যান্য যিকিরের তুলনায় এটাই উত্তম যিকির।[১৪৮]

প্রশ্ন: ফরজ সালাতের পরে ইমাম মুক্তাদী মিলে সম্মিলিতভাবে দু' হাত তুলে নিয়মিত যে প্রচলিত মুনাজাত করা হয় তার ভিত্তি কি?

উত্তর: ফরজ সালাতের পরে আমাদের ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মসজিদে সম্মিলিতভাবে সবসময় যে প্রচলিত মুনাজাত করা হয় তা একটি স্বীকৃত বেদআত। কুরআন বা সহীহ হাদীসে এর কোন ভিত্তি নেই। মেরাজে

[১৪৭] সুনানে আবু দাউদ ৫০৯২; মুসনাদে আহমদ ২০৪৩০।
[১৪৮] সহীহ মুসলিম ৭০৮৮।

সালাত ফরজ হওয়ার পরের দিন জোহরের সময় জিবরাইল (আ:) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে এসে প্রথমে জমজম কুপের কাছে নিয়ে অজু করা শিখান। অত:পর বায়তুল্লাহর সামনে নিয়ে দুই দিন পর্যন্ত সালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেন। প্রথম দিন সব সালাতগুলো আউয়াল ওয়াক্তে এবং দ্বিতীয় দিন আখেরী ওয়াক্তে সালাত আদায় করান। এরপরে জিবরাইল (আ) বললেন: হে মুহাম্মাদ (সা;)! এটাই হচ্ছে সালাতের ওয়াক্ত। এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়টিই হচ্ছে আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তী নবীদের সালাতের সময়। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে সালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যার ভিতরে অজু করা থেকে শুরু করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত যা কিছু আছে সব শিখানো হয়। তারপরে রাসূলুল্লাহ (সা:) সাহাবায়ে কেরামদেরকে সালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেন। শুধু তাই না বরং তিনি মৌখিকভাবেও নির্দেশ দেন। বুখারী, মুসলিমসহ হাদীসের প্রায় সব কিতাবেই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

عَن مَالك بن حويرث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَــالَ : " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

অর্থ: "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখতে পাচ্ছো, ঠিক সেভাবেই সালাত আদায় করো।"[১৪৯]

কিন্তু জিবরাইল (আ.) আল্লাহর রাসূল সা. কে এবং রাসূল সা. সাহাবাদেরকে যে সালাত শিক্ষা দিলেন সে সালাতের শেষে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার কথা কোনো সহীহ হাদীসে উল্লেখ নেই। রাসূল সা. এর যুগ থেকে এখন পর্যন্ত হারামাইন-শারীফাইনসহ মক্কা-মদীনার কোন মাসজিদে এই প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাত করা হয় না। সুতরাং এটি একটি বিদআত।

প্রশ্ন: জিবরাইল আ. যে রাসূলুল্লাহ সা. কে সালাতের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তার কোন সহীহ দলীল আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ। অবশ্যই আছে। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈসহ বহু হাদীসের কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে,

[১৪৯] বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَمَّنِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَــتْ قَــدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىَ – يَعْنِى الْمَغْرِبَ – حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ حِــينَ حَــرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِىَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَــرَ الــصَّائِمُ وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ».

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, জিবরাইল আ. বায়তুল্লাহর কাছে দুইবার আমার ইমামতি করেছেন। তিনি আমাকে নিয়ে জুহরের সালাত আদায় করলেন, যখন সূর্য ঢলে গেলো এবং তা জুতার ফিতা পরিমাণ ছিলো। তিনি আমাকে নিয়ে আসর পড়লেন যখন তার ছায়া এক মিসাল (কোন জিনিষের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া) পরিমাণ হলো। তিনি আমাকে নিয়ে মাগরীব পড়লেন যখন সায়েম ব্যক্তি ইফতার করে (সূর্যাস্তের পর)। তিনি আমাকে নিয়ে ইশা পড়লেন যখন শাফাক (সূর্য ডোবার পর আকাশে বিদ্যমান লাল আভা) গায়েব হয়ে গেলো। তিনি আমাকে নিয়ে ফজর পড়লেন যখন সায়েমের উপর পানাহার হারাম হয়ে যায় (সুবহে সাদিকের)। দু'আ

এরপর যখন দ্বিতীয় দিন হলো, তিনি আমাকে নিয়ে জোহর পড়লেন এক মিসালের সময়। আসর পড়লেন দুই মিসালের সময়। মাগরিব পড়লেন যখন সায়েম ইফতার করে। ইশা পড়লেন যখন রাত্র এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে যায়। ফজর পড়লেন যখন আকাশ খুব পরিস্কার হয়ে গেলো। এরপর তিনি আমার দিকে তাকালেন আর বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হচ্ছে আপনার পূর্বের সকল নবীদের সময়। আর (আপনার সালাতের সময় হলো) এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়।"[১৫০]

[১৫০] আবু দাউদ

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ সা. যে সাহাবাদেরকে সালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তার কোন দলীল আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ। অবশ্যই আছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ « صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ ». يَعْنِى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَـــابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِى أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَــوْقَ الَّذِى كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ « أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ ». فَقَـــالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ » (صحيح مـــسلم للنيسابوري)

অর্থ: সুলাইমান ইবনে বুরাইদা তার পিতা বুরাইদার মাধ্যমে নবী (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বুরাইদা) বলেছেন। এক ব্যক্তি নবী (সা:) কে সালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। নবী (সা:) তাকে বললেন, তুমি আমাদের সাথে দুইদিন সালাত পড়ো (লোকটি তাই করলো)। সূর্য যখন মাথার উপর থেকে হেলে পড়লো তখন নবী (সা:) বেললাকে আযান দিতে আদেশ করলেন। বেলাল আযান দিলেন।

অত:পর তিনি নবী (সা:) বেলালকে আযান দিতে আদেশ করলেন। বেলাল আযান দিলেন। অত:পর তিনি তাকে ইকামাত দিতে বললে তিনি যোহরের সালাতের ইকামাত দিলেন। অত:পর তিনি তাকে ইকামাত দিতে বললে তিনি যোহরের সালাতের ইকামাত বললেন। (অর্থাৎ তখন নবী (সা:) যোহরের সালাত পড়ালেন)। এরপর (আসরের সময় হলে) তিনি তাকে আসরের সালাতের ইকামাত দিতে বললেন। বেলাল ইকামাত দিলেন। নবী (সা:) তখন ‘আসরের সালাত পড়লেন। সূর্য তখনও বেশ উপরে ছিল এবং পরিষ্কার ও আরো ঝলমল দেখাচ্ছিল। তারপর আদেশ

দিলে বেলাল মাগরিবের আযান দিলেন এবং নবী (সা:) সূর্য ডুবে গেলেই মাগরিবের সালাত পড়লেন।

এরপর তিনি বেলালকে এশার সালাতের ইকামাত দিতে বললে বেলাল ইকামাত দিলেন এবং সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে সন্ধাকালীন লালিমা বা রক্তিম আভা দেখা যায় তা অন্তর্হিত হওয়ার পরপরই ‘ইশার সালাত পড়ালেন। পরে বেলালকে তিনি ফজরের সালাতের ইকামাত দিতে বললেন এবং সুবহে সাদিকের সাথে সাথেই ফজরের সালাত পড়ালেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি বেলালকে আদেশ করলেন এবং বেশ দেরী করে যোহরের সালাত পড়ালেন। (দ্বিতীয় দিনে) তিনি এমন সময় ‘আসরের সালাত পড়ালেন সূর্য তখনও বেশ উপরে ছিল। তবে আগের দিনের তুলনায় বেশ দেরী করে পড়ালেন। তিনি মাগরিবের সালাত পড়ালেন সূর্যের লাল আভা বিলীন হওয়ার পূর্বে। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর ইশার সালাত পড়ালেন। ফজর সালাত পড়ালেন এমন সময় যে আকাশ প্রায় পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে। এরপর তিনি বললেন যে, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? তখন সেই সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এখানে। তখন মহানবী সা. বললেন, তুমি (আমাকে গত দুই দিন) যেই সময় সালাত আদায় করতে দেখেছো (তার মধ্যবর্তী সময়ই হচ্ছে) সালাতের ওয়াক্ত।”[151]

সালাতের ওয়াক্ত শিক্ষা দেয়ার পর মুসলিম উম্মাহ কিভাবে সালাত শুরু করবে এবং কিভাবে সালাত শেষ করবে তাও প্রিয়নবী সা. তার নিম্নোক্ত হাদীসের মাঝে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مِفْتَــاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ». سنن أبي داود للسجستاني (22 /1)

অর্থ: “আলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা। সালাত শুরু করবে তাকবীরের মাধ্যমে এবং শেষ করবে সালামের মাধ্যমে।” [১৫২]

---

[১৫১] সহীহ মুসলিম।

[১৫২] সুনানে আবূ দাউদ।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ. صحيح مسلم للنيسابوري (2/ 54)

অর্থ: "আয়শা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. সালাত শুরু করতেন তাকবীরের মাধ্যমে, কিরা'আতের সময় আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতেন। যখন তিনি রুকু করতেন তখন তাঁর ঘাড় থেকে মাথা নীচুও করতেন না, উপরেও উঁচু করে রাখতেন না বরং একই সমতলে রাখতেন। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন, সোজা হয়ে না দাড়িয়ে সিজদায় যেতেননা। তিনি (প্রথম) সিজদা থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতেন না। তিনি প্রতি দুই রাকাআত আন্তর "আত্তাহিয়্যাত" পাঠ করতেন। তিনি বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তিনি শয়তানের বৈঠক থেকে নিষেধ করতেন। তিনি পুরুষ লোকদেরকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় বাহুদ্বয় মাটিতে ছড়িয়ে দিতে নিষেধ করতেন। তিনি সালামের মাধ্যমে সালাতের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন।" [১৫৩]

এসব হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহর রাসূল সা. ফরজ সালাতের পরে কখনো সাহাবাদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে প্রচলিত মুনাজাত করেন নি। বরং সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে, তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে সালাত শুরু হবে সালাম দিয়ে শেষ হবে। যেমন পূর্বে উল্লিখিত আলী রা. এর হাদীস হতে আমরা জানতে পেরেছি।

সুতরাং সালাম ফিরানোর মাধ্যমেই সালাত শেষ হয়ে যায়। তারপরে সালাতের আর কোনো সম্মিলিত অংশ বাকী থাকে না। যদি করা হয় তাহলে তা হবে বিদআত। তবে রাসূলুল্লাহ সা. ব্যক্তিগতভাবে ফরজ

[১৫৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০০২।

সালাতের পরে কিছু আমল করতেন এবং তা করার জন্য অন্যকেও উৎসাহিত করতেন। সাহাবায়ে কিরামগণও তা করতেন। আর সেটাই হলো সুন্নাহ। কিন্তু সেই সুন্নাহকে তুলে দিয়ে তার স্থানে প্রচলিত মুনাজাত নামক বিদআতকে প্রবেশ করানো হয়েছে। হাস্সান (রা.) যথার্থই বলেছেন,

وعن حسان قال : " ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة . " رواه الدارمي

অর্থ:- যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটায় তখন আল্লাহ (সুব:) ঐ পরিমাণ সুন্নাত তাদের থেকে তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না। [১৫৪]

প্রশ্ন: ফরজ সালাতের পরে রাসূল সা. কি আমল করতেন?

উত্তর: রাসূল সা. ফরজ সালাতের পরে বিভিন্ন দু'আ করতেন। সহীহ হাদীসে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কিছু আমল নিম্নে পেশ করা হলো।

❖ রাসুল সা. সালাতের সালাম ফিরানোর পরে তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ "আসতাগফিরুল্লাহ" পাঠ করতেন। অর্থ: "আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করছি।" [১৫৫]

❖ অতপর নিম্নের এই দু'আ টি পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

অর্থ: "হে আল্লাহ তুমি শান্তিময় তোমার নিকট হতেই শান্তির আগমন। তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাবান এবং কল্যাণময় তুমি।" [156]

❖ অতপর এই বলে দু'আ করতেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (صحيح البخاري)

[১৫৪] দারেমী সহীহ।

[১৫৫] বুখারী- ফাতহুল বারী ১১/১১৩।

[১৫৬] মুসলিম।

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তার কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতার মালিক কেবল মাত্র তিনিই। প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিঁনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ তুমি যা দান কর তা বাধা দেওয়ার কেহই নেই। আর তুমি যা দিবে না, তা দেওয়ার মত কেহই নেই। আর তোমার পাকড়াও হতে কোন সম্পদশালী বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধনসম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না।"[১৫৭]

❖ অতপর নিম্নের এই দু'আ পড়তেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

অর্থ:- "আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তার কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতার মালিক কেবল মাত্র তিনিই। প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিঁনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই। আমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদত করি। সকল নিয়ামতের মালিক একমাত্র তিনিই। অনুগ্রহও তার। এবং উত্তম প্রশংসা তারই। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমরা তার দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তার জন্য একনিষ্ঠ ভাবে মান্য করি যদিও কাফেরদের নিকট উহা অপ্রীতিকর।

❖ সা'আদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি তার সন্তানদেরকে নিম্ন বর্ণিত শব্দগুলো শিক্ষা দিতেন আর বলতেন রাসুল (সা.) এইগুলো দিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।

اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمـــر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر " . رواه البخاري

অর্থ: "হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করছি হীনমন্যতা থেকে (কাপুরুষতা)। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করছি কৃপণতা থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করছি অসহায় জীবন থেকে।

[১৫৭] সহীহ বুখারী।

আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করছি দুনিয়ার এবং কবর আযাবের ফিতনা থেকে।

❖ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি সালাতের পরে ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ ৩৩ বার الْحَمْدُ لِلهِ ৩৩ বার اللهُ أَكْبَرَ এই মোট ৯৯ বার এবং সর্বশেষ নিম্নের দু'আটির মাধ্যমে ১০০ বার পূর্ণ করবে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। দু'আটি এই:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

অর্থ:- "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তার কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতার মালিক কেবলমাত্র তিনিই। প্রশংসা কেবল তারই। তিনি সবকিছুর উপরে ক্ষমতাশালী।"[১৫৮]

❖ কা'আব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল (সা.) বলেছেন, ইহা মুআক্কিবাত (যা মৃত্যুর পরেও স্থায়ী হয়ে থাকে) যে ব্যক্তি এগুলো প্রতি সালাতের পরে বলবে সে কখনো বঞ্চিত হবে না। ৩৩ বার سُبْحَانَ اللَّهُ ৩৩ বার الْحَمْدُ لِلَّهِ ৩৪ বার اللَّهُ أَكْبَرُ।[১৫৯]

❖ সূরা নাস قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ সূরা ফালাক্ব قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ সূরা ইখলাস قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ও আয়াতুল কুরসী (সুরা বাক্বারার ২৫৫ নং আয়াত اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ একবার করে প্রতি সালাতের পরে। তবে ফজর ও মাগরীবের পরে সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা ইখলাস তিনবার করে পড়তেন।

❖ উম্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল (সা.) যখন সকালের সালাতের সালাম ফিরাতেন তখন এই দু'আ করতেন,

اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا ، وعملا متقبلا " . (سنن ابن ماجة) في الزوائد : رجال إسناده ثقات.

অর্থ: "হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম, হালাল রিযিক, গ্রহণযোগ্য আমল কামনা করি।"(হাদীসটি সহীহ)[১৬০]

[১৫৮] মুসলিম।
[১৫৯] নাসায়ী ১৩৪৮।
[১৬০] ইবনে মাজাহ।

সদকাতুল ফিতর:

প্রশ্ন: 'সাদকায়ে ফিত্‌র' এর হুকুম কি?

উত্তর: 'সাদাকায়ে ফিতর' মুসলিম নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, স্বাধীন-কৃতদাস সকলের উপর ওয়াজিব। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) (রমজান মাসে) প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় সকলের উপর এক 'সা' খেজুর বা এক 'সা' যব সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন।"[১৬১]

প্রশ্ন: 'সাদাকয়ে ফিতর' কার উপর এবং কখন ওয়াজিব হবে?

উত্তর: প্রত্যেক মুসলিম নারী, পুরুষ, ছোট, বড়, স্বাধীন ও কৃতদাসের উপর 'সাদাকয়ে ফিতর' আদায় করা ওয়াজিব। ঈদের রাতে এবং ঈদের দিন যদি সে নিজের ও তার পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতিরিক্ত সম্পদের মালিক হয়, তবে তাকে 'সাদাকায়ে ফিতর' দিতে হবে। 'সাদাকায়ে ফিতর' নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। যেমন: স্ত্রী ও সন্তানাদি। আর যদি তাদের নিজস্ব সম্পদ থাকে তাহলে তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকায়ে ফিতর' আদায় করতে হবে।পেটের বাচ্চার পক্ষ থেকে 'সাদাকায়ে ফিতর' দেয়া ওয়াজিব না। তবে যদি কোন ব্যাক্তি আদায় করে দেয় তাহলে নফল সাদাকা হিসাবে আদায় হবে।

(হানাফী ওলামাদের মতে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা তার মূল্য যার নিকটে থাকবে তার উপর যাকাত ও সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। তবে যাকাত এবং সাদাকাতুল ফিতরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাকাতের জন্য

[১৬১] সহীহ বুখারি ১০৫৩; সহীহ মুসলিম ২৩২৬;।

উল্লেখিত নেসাব পরিমান মাল বা তার মূল্যের উপর বছর অতিক্রম হওয়া আবশ্যকীয়। কিন্তু সাদাকাতুল ফিতরের জন্য বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়। শুধু ঐ মুহূর্তে (ঈদের দিন 'সুবহে সাদিকের' সময়) নেসাব পরিমাণ মাল বা তার মূল্য হলেই সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব।[১৬২]

প্রশ্ন: 'সাদাকায়ে ফিতর' কি পরিমাণ এবং কিসের মাধ্যমে আদায় করতে হবে?

উত্তর: 'সাদাকাতুল ফিতরের' পরিমান হল: রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগের এক 'সা'। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفطر صاعا من طعام (صحيح البخاري)

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (সা:) এর যুগে ঈদের দিন এক 'সা' পরিমান খাদ্য (সাদাকায়ে ফিতর) হিসাবে আদায় করতাম।[১৬৩]

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب (صحيح البخاري)

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা ফেতরার যাকাত এক 'সা' খাদ্য অথবা এক 'সা' ভুট্টা অথবা এক 'সা' খেজুর অথবা এক 'সা' পনির অথবা এক 'সা' কিসমিস দ্বারা আদায় করতাম।[১৬৪]

এই হাদীসগুলো সহ আরো অনেক গুলো সহীহ হাদীসের কারণে বেশির ভাগ মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরাম 'সাদাকায়ে ফিত্‌র' এক 'সা' পরিমান দিতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এক 'সা' এর পরিমাণ হলো 'চারশত আশি মিসকাল'। ইংরেজিতে এর ওজন হল **দুই কেজি ৪০**

[১৬২] ফতওয়ায়ে কাজী খান, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৪

[১৬৩] সহীহ বুখারি১৪৩৯।

[১৬৪] সহীহ বুখারি ১৪৩৫।

গ্রাম (মদিনার 'সা' এর হিসাব অনুযায়ী)। যে যেই এলাকায় বসবাস করে সে সেই এলাকার প্রধান খাদ্য থেকে ঐ পরিমাণ খাদ্য নিজের এবং তার অধিনস্ত প্রত্যেকের পক্ষ থেকে আদায় করবে। উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে সাহাবায়ে কিরাম রা. তাদের সেই যুগে তাদের প্রধান খাদ্য যা ছিল তা দিয়েই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। যা স্পষ্টভাবে নিম্নের হাদীসটিতেও উল্লেখ করা হয়েছে:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفطر صاعا من طعام . وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر(صحيح البخاري)

অর্থ: "আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগে ঈদের দিন এক সা' পরিমাণ খাদ্য সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে আদায় করতাম। আবূ সাঈদ (রা:) বলেন, তখন আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।"[১৬৫]

যেহেতু সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা হয় মিসকিনদের খাদ্যের জন্য কেনান হাদীসে বলা হয়েছে طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (অর্থাৎ মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা করা) সুতরাং যে এলাকার প্রধান খাদ্য যেটা সে এলাকায় তা দিয়েই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা উচিত। সুতরাং পশুর খাদ্য অথবা কোন ভিনদেশের খাদ্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করলে আদায় হবে না। তদ্রুপ পোষাক, বিছানা, আসবাব পত্র দ্বারা ফিতরা আদায় করলে আদায় হবে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা:) খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিধায় নির্দিষ্ট বস্তুর ব্যতিক্রম করা যাবে না। অনুরূপ খাদ্যের মূল্য পরিশোধের মাধ্যমেও আদায় হবে না। যেহেতু তা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আদেশের বিপরীত।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সাদাকায়ে ফিতরের পরিমান হলো জব বা জবের আটা হলে এক সা' প্রদান করবে। এক সা' সমান **তিন কেজি ২৬৪ গ্রাম** (হানাফী মাযহাব মতে 'সা'য়ের হিসাব অনুযায়ী)। আর গম বা তার ময়দা হলে অর্ধ সা' (দেড় কেজি ১৩২ গ্রাম তথা পৌনে দুই সের)। হানাফীদের দলীল হলো:

[১৬৫] বুখারী ১৪২২।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض النبي صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا . فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين (صحيح البخاري)

অর্থ: ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা:) প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা, আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর-ই-রামাজান হিসাবে এক 'সা' খেজুর বা এক এক 'সা' যব আদায় করা ফরজ করেছেন। **তারপর লোকেরা অর্ধ 'সা' গমকে এক 'সা'** খেজুরের সমমান দিতে লাগল। (রাবি নাফি' বলেন) ইবনে ওমর (রা:) খেজুর (সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে) দিতেন। এক সময় মদীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবনে ওমর (রা:) প্রাপ্ত বয়স্কও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের পক্ষ থেকেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও সাদাকার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং ঈদের এক-দু'দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন। [১৬৬]

উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আটা বা গমের পরিবর্তে তার মূল্য আদায় করাও জায়েয হবে।

প্রশ্ন: 'সাদাকায়ে ফিতর' আদায় করতে হবে কখন?

উত্তর: 'সাদাকয়ে ফিতর' আদায়ের সময় দু'ধরণের। (১) ফযিলতপূর্ণ সময়। (২) ওয়াক্তে জাওয়ায বা সাধারণ সময়।

প্রথমত ফযিলতপূর্ণ সময়: ঈদের দিন সকালে ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করা। সহীহ বুখারিতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বস (রা:) থেকে বর্ণিত:

[১৬৬] সহীহ বুখারি ১৪২৩।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) সাদাকাতুল ফিতরকে ফরজ করেছেন সায়েমকে (সিয়াম অবস্থার) অনর্থক কথা এবং অন্যায় কাজের গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাবারের ব্যাবস্থা করার জন্য। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করলো তারটা গ্রহণযোগ্য হবে আর যে ব্যক্তি সালাতের পরে আদায় করবে তারটা অন্যান্য সাদাকার মত সাধারণ সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।[১৬৭] সুতরাং বিনা কারণে সালাতের পর বিলম্ব করলে তা 'সাদাকাতুল ফিতর' হিসাবে গ্রহনযোগ্য হবে না। কারণ তা রাসূল (সা:) এর নির্দেশের পরিপন্থী। এজন্য ঈদুল ফিতরের সালাত একটু বিলম্ব করে আদায় করা উচিত যাতে মানুষ সালাতের পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারে। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূল (সা:) এর যুগে সাহাবায়ে কেরামগণ ঈদের দিন সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। হাদীস:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفطر صاعا من طعام (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (সা:) এর যুগে **ঈদের দিন** এক 'সা' পরিমাণ খাদ্য (সাদাকায়ে ফিতর) হিসাবে আদায় করতাম।"[১৬৮]

দ্বিতীয়ত যায়েজ সময়: ঈদের এক দুইদিন পূর্বে সাদাকাতুর ফিতর আদায় করা যায়েজ। বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নাফে' (র:) বলেন:

[১৬৭] সুনানে আবু দাউদ ১৬১১।

[১৬৮] সহীহ বুখারি১৪৩৯।

فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين (صحيح البخاري)

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) নিজের এবং ছোট-বড় সন্তানদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, রাবী নাফে বলেন, এমনকি তিনি আমার সন্তানদের পক্ষ হতেও। তিনি যাকাতের হকদারদেরকে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর পৌছে দিতেন।"[১৬৯]

মোট কথা: পূর্বের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল যে, সাদাকাতুল ফিতর ঈদের সালাতের পূর্বেই আদায় করতে হবে। বিনা করণে ঈদের সালাতের পর আদায় করা জায়েয নেই। তবে যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বিলম্ব করে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন সে এমন স্থানে আছে যে, তার নিকট আদায় করার মত কোন বস্তু নেই বা এমন কোন ব্যক্তিও নেই, যে এর হকদার হবে। অথবা হঠাৎ তার নিকট ঈদের সালাতের সংবাদ পৌঁছল, যে কারণে সালাতের পূর্বে আদায় করার সুযোগ পেল না। অথবা সে কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছিল, আর সে আদায় করতে ভূলে গেছে। এমতাবস্থায় সালাতের পর আদায় করলে কোন অসুবিধা নেই। কারণ সে অপারগ।

ওয়াজিব হচ্ছে: সাদাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি বা উকিলের মাধ্যমে যথাসময়ে সালাতের পূর্বে পৌছানো। যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রদানের নিয়ত করে, অথচ তার সঙ্গে বা তার নিকট পৌঁছাতে পারে এমন কারো সঙ্গে সাক্ষাত না হয়, তাহলে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করবে। বিলম্ব করবে না।

প্রশ্ন: 'সাদাকাতুল ফিতর' কাদেরকে প্রদান করা যাবে?

উত্তর: সাদাকাতুল ফিতর ও যাকাতের খাত একই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) আটটি খাত উল্লেখ্য করেছেন।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

[১৬৯] সহীহ বুখারি ১৪২৩।

অথ: "নিশ্চয় সাদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় (জীহাদরত মুজাহিদদের জন্য) এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" (সুরা তাওবা: ৬০) এ আয়াতে বর্ণিত আটটি খাতের বিস্তরিত বিবরণ:

(এক) ফুক্বারা- الفقراء:

فقراء ফুক্বারা শব্দটি فقـير ফক্বীর শব্দের বহুবচন। ফকীর এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের জীবিকার ব্যাপারে অন্যের মূখাপেক্ষী। কোন শরীরিক ত্রুটি বা বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে অথবা কোন সাময়িক কারণে আপাতত কোন ব্যক্তি অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য-সহায়তা পেলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ পর্যায়ের সব ধরণের অভাবী লোকের জন্য সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এতীম শিশু, বিধবা নারী, উপার্জনহীন বেকার এবং এমন সব লোক যারা সাময়িক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।

(দুই) মাসাকীন- المساكين:

مـساكين মাসাকীন শব্দটি مـسكين মিসকীন শব্দের বহুবচন। মিসকীন শব্দের মধ্যে দীনতা, দুর্ভাগ্য পীড়িত অভাব, অসহায়তা ও লাঞ্ছনার অর্থ নিহিত রয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে সাধারণ অভাবীদের চাইতে যাদের অবস্থা বেশী খারাপ তারাই মিসকীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শব্দটির ব্যাখ্যা করে বিশেষ করে এমন সকল লোকদেরকে সাহায্যলাভের অধিকারী গণ্য করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপায়-উপকরণ লাভ করতে পারেনি, ফলে অত্যন্ত অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু তাদের আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ কারোর সামনে তাদের হাত পাতার অনুমতি দেয় না। আবার তাদের বাহ্যিক অবস্থাও এমন নয় যে, কেউ তাদেরকে দেখে অভাবী মনে করবে এবং সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে। হাদীসে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ

وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ (بخاري)

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত রাসুল সা. ইরশাদ করেন; ঐ ব্যক্তি তো মিসকীন নয় যে, মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায় (ভিক্ষা করে) এক লোকমা দু'লোকমা, একটি-দুটি খেজুর পেলে সে চলে যায়। বরং প্রকৃত মিসকীন তো ঐ ব্যক্তি যার কাছে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ নাই, অপরদিকে তাকে সাহায্য করার জন্য চেনাও যায় না অর্থাৎ নিজের অসহায়ত্ব কারো কাছে প্রকাশ করে না। এবং যে নিজে দাঁড়িয়ে কারোর কাছে সাহায্যও চায় না, সে-ই মিসকীন।" অর্থাৎ সে একজন সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র গরীব মানুষ।

(তিন) আল আ'মিলীন العاملين:

আল-আ'মিলীন عامـل "আ'মেল" শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ যারা সাদাকা আদায় করা, আদায়কৃত ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা, সেসবের হিসেব-নিকেশ করা, খাতাপত্রে লেখা এবং লোকদের মধ্যে বণ্টন করার কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত থাকে। ফকীর বা মিসকীন না হলেও এসব লোকের বেতন সর্বাবস্থায় সাদকার খাত থেকে দেয়া হবে। এখানে উচ্চারিত এ শব্দগুলো এবং এ সূরার ১০৩ নং আয়াতের শব্দাবলী خذمن امـوالهم صـدقة (তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা উসূল করো) একথাই প্রমাণ করে যে, যাকাত আদায় ও বণ্টন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। তবে তাগুতী রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়। আমাদের বাংলাদেশ সরকারের একটি যাকাত বোর্ড রয়েছে এবং তাদের অধীনে কিছু আলেমও আছে। যারা রমজান মাস এসে সরকারের যাকাত ফন্ডে যাকাত দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। অথচ তারা জানে না যে, মুমিনরা ক্ষমতায় আসলে রাষ্ট্রীয় ভাবে চারটি কাজ করবে। পবিত্র কুরআনে নিম্ন আয়াতে বর্ণিত রয়েছে:

{ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } [الحج: ৪১]

অর্থ: "তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ

দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।" (সুরা হাজ্জ: ৪১)

এখানে পরিস্কার ভাবে মুসলিম রাষ্ট্রকে চারটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, এই চারটি কাজের মধ্য থেকে তিনটির কোন খবর নেই। মাঝখান থেকে দ্বিতীয়টির জন্য বোর্ড গঠন করে। এটা হচ্ছে সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ। যারা সালাত কায়েম করার মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন করে না বরং নানা দুর্নীতি আর অপকর্মে বারবার যারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় তারা যে যাকাতের অর্থও লুটপাট করবে না, আত্মসাৎ করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাই আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ দিতে হবে আর তা না পারা পর্যন্ত মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইমারাহ্ গঠন করে তার মাধ্যমে আমিলীন নিয়োগ করে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(চার) আল মু'আল্লাফাতু কুলুবুহুম المؤلفة قلوبهم:

যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য। মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার যে হুকুম এখানে দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শত্রুতার তীব্রতা ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে অথবা যারা কাফেরদের শিবিরে অবস্থান করছে ঠিকই কিন্তু অর্থের সাহায্যে সেখান থেকে ভাগিয়ে এনে মুসলমানদের দলে ভিড়িয়ে দিলে তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে কিংবা যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং তাদের পূর্বেকার শত্রুতা বা দুর্বলতাগুলো দেখে আশংকা জাগে যে, অর্থ দিয়ে তাদের বশীভূত না করলে তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, এ ধরণের লোকদেরকে স্থায়ীভাবে বৃত্তি দিয়ে বা সাময়িকভাবে এককালীন দানের মাধ্যমে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী অথবা বাধ্য ও অনুগত কিংবা কমপক্ষে এমন শত্রুতে পরিণত করা যায়, যারা কোন প্রকার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। এ খাতে গনীমতের মাল ও অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেও ব্যয় করা যেতে পারে। এ ধরণের লোকদের জন্য ফকীর, মিসকীন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই। বরং ধনী ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের যাকাত দেওয়া যেতে পারে। হানাফী মাযহাব মতে এই খাতটি রহিত হয়ে গিয়েছে।

(পাঁচ) আর-রিক্বাব :الرِّقَاب:

দাসদেরকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা দু'ভাবে হতে পারে। এক. যে দাস তার মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছে যে, সে একটি বিশেষ পরিমাণ অর্থ আদায় করলে মালিক তাকে দাসত্ব মুক্ত করে দেবে। তাকে দাসত্ব মুক্তির এ মূল্য আদায় করতে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায়। দুই. যাকাতের অর্থে দাস কিনে তাকে মুক্ত করে দেয়া। এর মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে সকল ফকীহ্ একমত। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটিকে হযরত আলী (রাযিঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর, লাইস, সাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, হানাফী ও শাফেয়ীগণ নাজায়েয গণ্য করেন। অন্যদিকে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হাসান বাসরী, মালেক, আহমদ ও আবু সাওর একে জায়েয মনে করেন।

(ছয়) আল-গারেমীন الْغَارِمِينَ: অর্থাৎ এমন ধরণের ঋণগ্রস্ত, যারা নিজেদের সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলে তাদের কাছে নেসাবের চাইতে কম পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে। তারা অর্থ উপার্জনকারী হোক বা বেকার, আবার সাধারণ্যে তাদের ফকীর মনে করা হোক বা ধনী। উভয় অবস্থায় যাকাতের খাত থেকে তাদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ্ এ মত পোষণ করেছেন যে, অসৎকাজে ও অমিতব্যয়িতা করে যারা নিজেদের টাকা পয়সা উড়িয়ে দিয়ে ঋণের ভারে ডুবে মরছে, তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের সাহায্য করা যাবে না।

(সাত) ফি-সাবিলিল্লাহ فِي سَبِيلِ الله (আল্লাহর পথে): শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব সৎকাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এমন সমস্ত কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে কেউ কেউ এমত পোষণ করেছেন যে, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে যাকাতের অর্থ যে কোন সৎকাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'সালাফে সালেহীন' বা প্রথম যুগের ইমামগণের অধিকাংশ অংশ যে মত পোষণ করেছেন সেটিই যথার্থ সত্য।

তাদের মতে এখানে আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব যুদ্ধ ও সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কুফরী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। যেসব লোক যুদ্ধ ও সংগ্রামে রত থাকে, তারা নিজেরা সচ্ছল ও অবস্থাসম্পন্ন হলেও এবং

নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন না থঅকলেও তাদের সফর খরচ বাবদ এবং বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অনুরূপ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্থ সময় ও শ্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও যাকাতের অর্থ এককালীন বা নিয়মিত ব্যয় করা যেতে পারে।

এখানে আর একটি কথা অনুধাবন করতে হবে। প্রথম যুগের ইমামগণের বক্তব্যে সাধারণত এ ক্ষেত্রে 'গাযওয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যুদ্ধের সমার্থক। তাই লোকেরা মনে করে যাকাতের ব্যয় খাতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথের যে খাত রাখা তা শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু আসলে জিহাদ 'ফী সাবীলিল্লাহ' যুদ্ধ বিগ্রতের চাইতে আরো ব্যাপকতর জিনিসের নাম। কুফুরের বানীকে অবদমিত এবং আল্লাহর বাণীকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করা আর আল্লাহর দীনকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করার জন্য দাওয়াত ও প্রচারের প্রাথমিক পার্যায়ে অথাব যুদ্ধ-বিগ্রতের চরম পর্যায়ে যেসাব প্রচেষ্ট ও কাজ করা হয়, তা সবই এ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর আওতাভূক্ত। কুরআনের আরেকটি আয়াতে বিষয়টিকে আরও সুন্দর করে বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে:

{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}

অর্থ: বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে এমন লোক তারা নয়। [১৭০]

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় আটকে গিয়েছে বলতে মুজাহিদীনদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা জিহাদ করতে গিয়ে ব্যস্ত থাকায় কামাই-রোজগার, ব্যবসা-বানিজ্য করতে পারে না। তাদের লেবাস পোষাক

[১৭০] সুরা বাকারা ২৭৩।

দেখলেও তাদেরকে অভাবী মনে হয় না। রাসূল (সা:) এর সময় মুহাজিরগণ ও আনসারদের মধ্যে থেকে আসহাবে সুফ্‌ফাহ নামে তিন চারশ লোকের একটি দল ছিল যারা সার্বক্ষণিক আল্লাহর রাসূল (সা:) এর কাছেই থাকতেন। যাকে যখন যে দায়িত্ব দেয়া হত তারা পূরণ করত। জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

এ আয়াতে বিশেষ করে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বর্তমানেও এরকম একদল মুজাহিদীন তৈরি করা প্রয়োজন যারা সেই আসহাবে সুফ্‌ফাহর মত সদা প্রস্তুত থাকবে। যখনই কোন নাস্তিক, মুরতাদ ইসলামের কোন বিষয় কটাক্ষ করবে অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে তখনই তাদের উপর আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে। এরকম বাহিনী তৈরি করার জন্য তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র কিনে দেয়ার জন্য এবং তাদের পরিবারের খোরপোষের ব্যবস্থা করার জন্য যাকাত এবং সাদাকার একটি বড় অংশ ব্যয় করা খুবই জরুরী।

(আট) ইবনুস সাবীল ابن السبيل **(মুসাফির) :** মুসাফির তার নিজের গৃহে ধনী হলেও সফরের মধ্যে সে যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তাহলে যাকাতের খাত থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে। এখানে কোন কোন ফকীহ শর্ত আরোপ করেছেন, অসৎকাজ করা যার সফরের উদ্দেশ্য নয় কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই এআয়াতের প্রেক্ষিতে সাহায্য লাভের অধিকারী হবে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ ধরণের কোন শর্ত নেই। অন্যদিকে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি, যে ব্যক্তি অভাবী ও সাহায্য লাভের মুকাপেক্ষী তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে তার পাপাচার বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে যোনাহগার ও অসৎ চরিত্রের লোকদেরকে বিপদে সাহায্য করলে এবং ভাল ও উন্নত ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চরিত্র সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালালে তা তাদের চরিত্র সংশোধনের সবচেয়ে বড় উপায় হতে পারে।

তবে সাদাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে মিসকিনদের অগ্রাধিকার দেয়া বাঞ্চনীয়। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে, 'طعمة للمساكين 'মিসকিনদের খাবার হিসাবে' তাছাড়া সাদাকাতুল ফিতরের আরেকটি বড় উদ্দেশ্য ফকির মিসকিনদেরও ঈদের আনন্দে ভাগীদার করা। আর সে কারণেই

হয়তো ঈদের সালাতের পূর্বেই 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, একজনের 'সাদাকাতুল ফিতর' কয়েকজন হকদারকে, আবার কয়েকজনের সাদাকাতুল ফিতর একজন হকদারকে দেওয়া যাবে তাতে কোন অসুবিধা নাই।

মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখী খেদমতে নিয়োজিত। সত্য প্রতিষ্ঠায় ও মিথ্যার মূলোৎপাটনে এক সাহসী প্রতিষ্ঠান। রমজানের এই বরকতময় মুহূর্তে আপনার সার্বিক সহযোগিতা, দু'আ, দান, সাদাকাত ও যাকাতের উত্তম পাত্র।
মারকাজের এই বহুবিধ দীনী ও জনকল্যাণমূলক কাজে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের একান্ত কাম্য।

আপনি মারকাজের জন্য, মারকাজ সকলের জন্য।

: একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা (বোনাস) :

أن لله تسعة و تسعين أسما مأة الا واحدا من احصاها دخل الجنة (متفق عليه)

অর্থ: "আল্লাহর তায়ালার ৯৯ টি নাম রয়েছে; এক কম একশত, এবং যে এগুলোকে মুখস্ত করবে (এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে, অর্থের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী হা/২৭৩৬ এবং মুসলিস হা/২৬৭৭)

কুরআন থেকে নেওয়া আল্লাহর তায়ালার নামসমূহ:-

১। اَللّٰهُ - আলৱাহ ২। الإِلَٰهُ - যিনি একমাত্র ইবাদাত যোগ্য। ৩। اَلْحَيُّ - চিরঞ্জীব। ৪। اَلْقَيُّوْمُ - সর্বদা রক্ষণাবেক্ষনকারী। ৫। আর রাব- রব। ৬। اَلرَّحْمٰنُ - যিনি পরম করবনাময়। ৭। اَلرَّحِيْمُ - অসীম দয়ালু। ৮। اَلْمَلِكُ - মালিক, অধিপতি, রাজাধিরাজ ৯। اَلْقُدُّوْسُ - অতি পবিত্র। ১০। اَلسَّلَامُ - যিনি সব ত্রবটি থেকে মুক্ত, নিখুত। ১১। اَلْمُؤْمِنُ - পূর্ন বিশ্বস্ত এবং নিরাপত্তাদাতা। ১২। اَلْمُهَيْمِنُ -সর্বদা পর্যবেৰক, স্বাৰী। ১৩। اَلْجَبَّارُ -মহা প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত, সমুন্নত। ১৪। اَلْمُتَكَبِّرُ - সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত। ১৫। اَلْخَالِقُ - সৃষ্টিকর্তা। ১৬। اَلْبَارِئُ -উদ্ভাবক, উদ্ভাবনকারী। ১৭। اَلْمُصَوِّرُ - আকৃতিদাতা, রূপদাতা। ১৮ العزيز মহা সম্মানিত। ১৯। اَلْحَكِيْمُ - প্রজ্ঞাময়, মহাবিজ্ঞ। ২০। اَلْاَوَّلُ - তিনিই প্রথম, যার পূর্বে কোন কিছু নেই। ২১। اَلْاٰخِرُ - তিনিই শেষ। ২২। اَلظَّاهِرُ - সবচেয়ে উচু, সর্বোনত। ২৩। اَلْبَاطِنُ - সবচেয়ে নিকটে। ২৪। اَلْعَلِيْمُ -সর্বজ্ঞানী। ২৫। اَلْغَفُوْرُ - পরম ৰমাশীল। ২৬। اَلْوَدُوْدُ - অতিশয় প্রেমময়, পরম স্নেহশীল। ২৭। اَلْمَجِيْدُ - পরিপূর্ন সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী। ২৮। اَلرَّزَّاقُ - রিযিকদাতা, জীবিকাদাতা। ২৯। اَلْقَوِيُّ - অসীম শক্তিশালী, মহা ৰমতাবান। ৩০। اَلْمَتِيْنُ - প্রবল পরাক্রান্ত। ৩১। الحَافِظُ - রৰাকর্তা,

শ্রেষ্ঠ রৰক। ৩২। اَلْحَفِيْظُ- হিফাযতকারী। ৩৩। العَالِمُ- সর্বজ্ঞানী। ৩৪। اَلْكَبِيْرُ - সর্ব মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ। ৩৫। اَلْمُتَعَالِيْ- সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান, সমুন্নত এবং সর্বোচ্চ। ৩৬। المَلِيكُ- সার্বভৌমত্বের অধিকারী। ৩৭। اَلْمُقْتَدِرُ- সর্ব শক্তিমান। ৩৮। اَلْاَحَدُ- এক এবং একমাত্র। ৩৯। اَلصَّمَدُ- স্বয়ংসম্পূর্ন, অমুখাপেৰী। ৪০। اَلْوَاحِدُ - এক এবং অদ্বিতীয়। ৪১। القَهَّارُ - অপ্রতিরোধ্য, প্রতাপশালী। ৪২। اَلْوَلِيُّ - অভিভাবক, সাহায্যকারী। ৪৩। اَلْحَمِيْدُ- প্রশংসিত। ৪৪। المَوْلَى- অভিভাবক ও সাহায্যকারী। ৪৫। النَّصِيرُ- সাহায্যকারী। ৪৬। اَلرَّقِيْبُ- তত্ত্বাবধায়ক। ৪৭। اَلشَّهِيْدُ- সর্ব বিষয়ে স্বাৰী। ৪৮। اَلسَّمِيْعُ- সর্বশ্রোতা। ৪৯। اَلْبَصِيْرُ- সর্বদ্রষ্টা। ৫০। اَلْحَقُّ- যিনি সত্য। ৫১। المُبِينُ- সুস্পষ্ট। ৫২। اَللَّطِيْفُ - সুক্ষদর্শী ও দয়ালু। ৫৩। اَلْخَبِيْرُ- যিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ন সচেতন। ৫৪। القَرِيبُ- নিকটবর্তী। ৫৫। اَلْمُجِيْبُ- সাড়াদানকারী। ৫৬। اَلْكَرِيْمُ-সবচেয়ে বেশী উদার, মহৎ, দানশীল। ৫৭। الأَكْرَمُ- অতি উদার, অতি মহান, মহানুভব। ৫৮। اَلْعَلِيُّ- সমুন্নত, সর্বশ্রেষ্ঠ। ৫৯। اَلْعَظِيْمُ- সবচেয়ে মহান, মহীয়ান। ৬০। اَلْحَسِيْبُ- যিনি যথেষ্ট, হিসাবগ্রহনকারী। ৬১। اَلْوَكِيْلُ- সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসকারী, কর্মবিধায়ক, যার উপরে ভরসা করা হয়। ৬২। اَلشَّكُوْرُ- যিনি সবচেয়ে প্রস্তুত গুনোপলব্দি করতে এবং প্রচুর বিনিময় দানে, অতিশয় গুনগ্রাহী। ৬৩। اَلْحَلِيْمُ-সর্বাধিক সহিঞ্চু, পরম সহনশীল। ৬৪। الشَّاكِرُ- সর্বদা গুনগ্রাহী এবং পুরষ্কারদাতা। ৬৫। الوَهَّابُ- পরমদাতা, মহান দানশীল। ৬৬। القَاهِرُ- অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। ৬৭। اَلْغَفَّارُ - অত্যন্ত ৰমাশীল, যিনি বারবার ৰমা করেন। ৬৮। اَلْبَرُّ - অত্যন্ত সদাশয় এবং দয়াশীল, কৃপাময়। ৬৯। اَلتَّوَّابُ- তাওবাহ কবুলকারী। ৭০। اَلْفَتَّاحُ- উত্তম ফায়সালাকারী, সূচনাকারী। ৭১। اَلرَّؤُوْفُ- অত্যন্ত দয়ার্দ্র। ৭২। اَلْمُقِيْتُ-

যিনি সর্বদা সব কিছু করতে সৰম, সব কিছুর ব্যাপারে স্বাৰী, সর্বশক্তিমান ব্যবস্থাপক। ৭৩। اَلْوَاسِعُ- সৃষ্টির প্রয়োজন পূরনে যিনি যথেষ্ট, প্রাচুর্যময়। ৭৪। اَلْوَارِثُ- চূড়ান্ত এবং স্থায়ী মালিকানার অধিকারী, প্রকৃত উত্তরাধীকারী। ৭৫। الأَعْلَى- সর্বোচ্চ, সুমহান। ৭৬। المُحِيطُ- পরিবেষ্টনকারী। ৭৭। اَلنَّاصِر আন্ নাছির, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। ৭৮। الحَفِيُّ- অত্যন্ত দয়াবান। ৭৯। الخَلاَّقُ- মহাস্রষ্টা। ৮০। اَلْعَفُوُّ - পাপমোচনকারী, ৰমাকারী। ৮১। اَلْغَنِيُّ - স্বয়ং সম্পূর্ন যিনি সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত, অভাবমুক্ত, সম্পদশালী। ৮২। القَادِرُ- যিনি পূর্ন সৰম। ৮৩। القَدِيرُ - সর্বশক্তিমান।

সাহীহ হাদীস থেকে নেওয়া আল্লাহ তায়ালার নামসমূহ:-

৮৪। اَلْمُقَدِّمُ- যিনি প্রথম, এটাও বলা হয় যিনি অগ্রবর্তীকারী। ৮৫। اَلْمُؤَخِّرُ- যিনি শেষ, এটাও বলা হয় যিনি পশ্চাদবর্তীকারী। ৮৬। الحَكَمُ- শ্রেষ্ঠ বিচারক। ৮৭। اَلْقَابِضُ- রিযিক্ব সংযতকারী। ৮৮। اَلْبَاسِطُ - রিযিক্ব সম্প্রসারনকারী, প্রচুর রিযিক্ব মঞ্জুরকারী। ৮৯। الرَّفِيقُ- দয়াশীল এবং মার্জিত (kind and lenient). ৯০। المُعْطِي- সুমহান দাতা। ৯১। المَنَّانُ- মহাউপকারী, যিনি দানশীলতায় বদান্য ও উদার। ৯২। السُّبُّوحُ- সম্মানিত ও পরিপূর্ন, গৌরবময় ও মহিমান্বিত। ৯৩। الشَّافِي- আরোগ্যদাতা, রোগমুক্তিকারী। ৯৪। الجَمِيلُ- সুন্দরতম (Graceful, Beautiful)। ৯৫। الحَيِيُّ- মর্যাদাময় লজ্জাশীলতার অধিকারী। ৯৬। الجَوَادُ- মহানুভব,উদার। ৯৭। الطَّيِّبُ- উত্তম, পবিত্র। ৯৮। السَّيِّدُ- প্রভু, মালিক। ৯৯। الوِتْرُ - যিনি এক। (The One)